লোক কারুশিল্প মেলা
ও
লোকজ উৎসব '৯৬
প্রতিবেদন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ প্রতিবেদন
Folk Art & Crafts Fair and Festival '96 Report

প্রধান সম্পাদক ঃ
বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

নির্বাহী সম্পাদক ঃ
সৈয়দ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

সহকারী সম্পাদক ঃ
মোঃ রবিউল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত গবেষণা অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ ঃ
জসিম উদ্দিন
প্রদর্শন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

ফটোগ্রাফী ঃ
সফিকুর রহমান
ফটোগ্রাফার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায় ঃ
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
পোঃ আমিনপুর
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

মুদ্রণ ঃ
এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস
৪৩/১০ সি, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৯৫৫৪৬১৩, ৯৫৫৫৯৩৭

মূল্য ঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা)

সূচীপত্র

১।	সম্পাদকীয়	৫
২।	লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ **ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী**	৭-৮
৩।	লোক কারুশিল্প মেলা ' ও লোকজ উৎসব '৯৬-এর বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য **মোঃ ইয়ামিন খান**	৯-১৫
৪।	মেলার দর্শক সংস্কৃতি ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ **এ কে এম মুজ্জাম্মিলুল হক**	১৬-২০
৫।	আর্ট এবং ফোক আর্ট সমন্বয় প্রসংগে ঃ প্রেক্ষিত লোকজ জীবন্ত প্রদর্শনী **মোঃ খলীলুর রহমান**	২১-২৬
৬।	মেলার সেমিনার প্রসঙ্গ ঃ লোকজ সংস্কৃতির স্থায়ী বিস্তারে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ **দিলরুবা বেগম**	২৭-৩০
৭।	লোকজ খেলার স্বাজাত্য দর্শন এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মধারা ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ **মোঃ রবিউল ইসলাম**	৩১-৩৭
৮।	লোক মেলার প্রসারে লোকজ উৎসব ঃ প্রেক্ষিত লোকজ উৎসব '৯৬ **জসিম উদ্দিন**	৩৮-৪২
৯।	লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর গবেষণা প্রেক্ষিত **বিশ্বনাথ সরকার**	৪৩-৪৯
১০।	বস্তু সংস্কৃতির দলিলীকরণ ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ **সৈয়দ মাহবুব আলম**	৫০-৫৭
১১।	বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদন	৫৮-৬০

সম্পাদকীয়

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬

ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির (Traditional Culture) অন্যতম অঙ্গন হলো লোক ও কারুশিল্প। আর এর উৎস হলো গ্রামীণ সহজ সরল মানুষ। এই মানুষই তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে উৎপাদনের তাগিদ অনুভব করে, পরিশেষে সেখানে যোগ হয় তার চোখের সৌন্দর্য এবং আত্মার সোন্দর্য। সৃষ্টি হয় নান্দনিক শিল্প সুষমা (Aesthetic Excellence)। তাই লোক ও কারুশিল্পের মাঝে আমরা দুটি দিক দেখতে পাই—এক, প্রয়োজন বা বাণিজ্যিক দিক আর দুই, নান্দনিক শৈল্পিক দিক। অর্থাৎ একটি অস্তিত্বের প্রশ্নে সত্য শিল্প আরেকটি অস্তিত্বের প্রশ্নে সুন্দর শিল্প। একটি দেশের সত্য ও সুন্দরের এই প্রকাশই হলো লোকও কারুশিল্পের মূল ভূমিকা।

একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা আরো উপলব্ধি করতে পারি লোক ও কারুশিল্পের এই মূল ভূমিকার উপরই দাঁড়িয়ে আছে সেই দেশের, তার সমাজের সভ্যতার বিকাশ তথা বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ। লোক ও কারুশিল্পের ভূমিকা যদি সামাজিক, ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক, নান্দনিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করি এই উক্তি যাচাই করা কষ্টকর হবার কথা নয়। কারণ এই আদি এবং অকৃত্রিম শিল্পটিই যে কোন প্রেক্ষাপটের ভিত্তি বা মূল হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা দিয়ে রূপান্তরের ধারায় বিচিত্র শাখা-প্রশাখার ডানা মিলিয়ে থাকে সত্য আর সুন্দরের প্রকাশের। আর কর্মধারায় মানুষের এই সত্য ও সুন্দরের প্রকাশই হলো সভ্যতার প্রকাশ।

আর এই প্রকাশকে ধরে রাখার প্রয়াসই হলো আরেকটি কালচার যা অনেক সভ্যদেশের উন্নত দেশগুলো অত্যন্ত নিরীক্ষামূলকভাবে করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও আনাচে-কানাচে এর প্রচেষ্টা চলছে। তাই গুরুত্বপূর্ণভাবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনেরই দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অত্যাধিক।

বিশ্বের নানান দেশে এবং আমাদের দেশেও লোক ও কারুশিল্পের সত্য ও সুন্দরের বেশীর প্রকাশই মেলার বৈচিত্র্যময় অঙ্গনেই ঘটে থাকে। সেই আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বরং সে অঙ্গনের পথটি বিস্তারিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক আর নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে এটা বুঝতে কষ্ট হয়না।

দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় লোক ও কারুশিল্পের মতো ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক প্রকাশ আর বিকাশ মেলার অঙ্গনেই সুশোভিত ফুলের মতো ফুটে ফুটে উঠে। ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা বস্তুত এখান থেকে আরম্ভ। জাতির সংস্কৃতি আর সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম এক উপকরণ হলো মেলা।

তাই মেলাকে শুধু আনন্দঘন এক পর্ব বলে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এরও এক ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক, নান্দনিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আছে। বস্তুতঃ ফাউণ্ডেশন সেই প্রেক্ষাপটে মেলাকে এক গবেষণা ধর্মী পর্যায়ে নেবার জন্য নিরলশ পরিশ্রম আর পরীক্ষা করে যাচ্ছে। সফলতার মুখও একটু একটু করে ফুটে উঠেছে।

স্বততঃ পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ করে মেলার উপকরণগুলো নিয়ে বর্ণনামূলক গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন তৈয়ার করা হচ্ছে মেলার তাত্ত্বিক রূপ সৃষ্টি করে। এবারও মেলার উপকরণ গুলোর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ফাউণ্ডেশনের কর্মী লেখকগণ নানা দিক নির্ণয় করে প্রতিবেদন তৈয়ারের প্রয়াস নিয়েছে। এদের সবার প্রচেষ্টা নতুন, এরা সবাই নতুন লেখক। কিন্তু একেক সময় মনে হয়েছে সব লেখাই যেন একই রকম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। খুব সূক্ষ্মভাবে মেলার উপকরণের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে প্রতিবেদনের প্রবন্ধগুলো বিরচিত হয়েছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সেটা বোঝার জন্য বিদগ্ধ পাঠককে অনুরোধ জানাব। আমরা আশাকরি এ ভাবে গবেষণার দৃষ্টি দিয়ে লিখতে লিখতে এরাই একদিন লোক ও কারুশিল্প তথা লোক সংস্কৃতির, তথা লোক সভ্যতার বিশেষজ্ঞ লেখক হিসাবে পরিচিতি পাবে। ঐতিহাসিক ভাবে অবদান রাখবে গবেষণার প্রেক্ষাপটে লোক সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ করে দেশের সভ্যতার পটভূমি তুলে ধরতে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি, জানবে এর প্রকাশ বিকাশের ক্ষেত্র মেলার অঙ্গন, যা Traditional Culture এর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশনের "লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ প্রতিবেদন" পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে আশা রাখি।

বজলুর রহমান ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

অমর শিল্পী জয়নুল আবেদিনের স্বপ্ন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৭৫) যা ক্রমে ক্রমে রূপ নেবে একটি ছোট্ট বাংলাদেশ বা 'মিনি বাংলাদেশ'-এই ১৯৯৬ পর্যন্ত বহু পর্যায় পার হয়ে সত্যি তা সোনার বাংলার ঐতিহাসিক সোনারগাঁকে করে তুলছে দেশী বিদেশী বহু দর্শক পর্যটকের মিলনভূমি। আবহমান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার শিল্পগ্রাম কর্মসূচীতে গ্রামীণ জীবন, তার হস্তশিল্প লোকশিল্প কারুশিল্প, তা নিয়ে গবেষণা, লোক-সংস্কৃতির বহুবিধ মৌলিক উপাদান, তার খেলাধূলা, রূপান্তরের ধারা, তার সংগীত, হাসিকান্না, সবই তুলে ধরার ব্যবস্থা ছিল ১৯৯৬ পর্যন্ত যা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে দেশ ও বিদেশের বহুপত্র পত্রিকা, বেতার ও বিটিভিতে। তাছাড়া এই সব আবহমান উৎসবের জীবন্ত চিত্র প্রতিদিনের দর্শক ও শ্রোতাদের হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে খুঁজে পেতে সাহায্য করছে যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে বক্ষমান বিভিন্ন প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনে।

লোক ও কারুশিল্প মেলা এবং লোকজ উৎসব' ৯৬ এর বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্য, মোঃ ইয়ামিন খান সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিচিত্র ব্যানারে, ফেষ্টুন, শ্লোগান, লোকমটিফ আলোক সজ্জায় উৎসব কিভাবে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছিল। এ প্রবন্ধে মেলা ও উৎসবের একটি প্রামাণ্য ও বাস্তব চিত্রই ফুটে উঠেছে যা দর্শকবৃন্দ নিজেরাও উপলব্ধি করেছেন।

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর গবেষণার প্রেক্ষিত, (বিশ্বনাথ সরকার) 'জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান' কবি গুরুর সেই অমর বাণীকেই স্মরণ করিয়ে দেবে। মৌলিক গবেষণা (Basic Research) এবং ফলিত গবেষণা (Applied Research) কার্যক্রম গবেষণা (Action Research) লোক সমাজের জীবনধারণ রীতি থেকে শুরু করে শস্য ফলনের রীতি, পানাহার, খেলাধুলা, লৌকিক উৎসব, অভিনয়, নৃত্য, চিত্রকলা-ভাস্কর্য, কারুশিল্প, পোষাক-পরিচ্ছদ-অলংকার, মাটির হাড়িপাতিল, পোড়া মাটির ফলক, পুতুল, নকশী কাঁথা, পট, পাটি, দেওয়াল চিত্র, পাটের শিকা, শোলার কাজ, পিতল তামা, কাসার কাজ, লোকজ বাদ্যযন্ত্র, লোকজ সংগীত, লোক কারুশিল্প এবং লোকজ উৎসব ইত্যাদি যা কিছু লোক জীবনের সংগে সম্পৃক্ত সব সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধাবলী, সব কিছুই গবেষণার পটভূমিতে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বস্তু সংস্কৃতির দলিলীকরণ ঃ প্রেক্ষিত লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬, প্রবন্ধে সৈয়দ মাহবুব আলম প্রাকৃতিক পরিবেশ; সাংস্কৃতিক পরিবেশ; বস্তু সংস্কৃতি; বস্তু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য; বস্তু সংস্কৃতি ও গ্রাম; লোক সংস্কৃতি ও বস্তু সংস্কৃতি; লোকজীবন ধারা; লোকজ উৎসব, মেলা; বস্তু সংস্কৃতি ও লোকজ উৎসব, মেলা; বস্তু সংস্কৃতির দলিলীকরণ ও লোক মেলা; বস্তু সংস্কৃতি, লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ ইত্যাদি পর্যায়ে পূর্ব প্রতিবেদন গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ পাঠকদের কাছেও এর গুরুত্ব তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তত্ত্ব ও তথ্যের প্রেক্ষাপটে লেখা এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণেও সক্ষম হবেন।

আর্ট এবং ফোক আর্ট সমন্বয় প্রসঙ্গে ঃ প্রেক্ষিত লোকজ জীবন্ত প্রদর্শনী, (মোঃ খলীলুর রহমান) লোকায়ত বাংলার জেলে, কুম্ভকার, ছুতার, নাপিত, কর্মকার, তাঁতী, বেদে, সাপুড়ে, ফকিরালী, মোল্লাজী, গাইন, পটুয়া, দৈ-ওয়ালা, ঘুড়ি বানানো, গ্রামীণ মক্তব, চুড়ি ওয়ালী, কবিরাজ, জ্যোতিষী, বিয়ের ঘটক, গ্রামীণ বিচার, ঢেকিতে ধানবানা, গায়ে হলুদ, গরুরগাড়ী, ঘোড়ারগাড়ী, বরযাত্রা, বানরনাচ, বায়স্কোপ, লোকপিঠা তৈরী, মোরগ লড়াই, বাঁশী বাদক, ইত্যাদি বহু দৃশ্য-যা গ্রাম বাংলায় দেখা যেত, হয়তো এখনো আছে, সুন্দর বর্ণনাও উদাহরণ তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে, সুখ পাঠ্য অথচ তথ্যনির্ভর। প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি গ্রাম বাংলায় এসব চারু, কারু ও লোকশিল্প কেন্দ্রিক লৌকিক আচার-আচরণ জীবনধারায় চলছে। আধুনিক নগরজীবনের প্রভাবে এসব ঐতিহ্যের আচরণ এখন ক্রমশঃ হারিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ফাউণ্ডেশন লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবে লৌকিক আচার-আচরণ ও লোকশিল্প কেন্দ্রিক এসব জীবন্ত প্রদর্শনীর যে আয়োজন করেছে প্রবন্ধকার এর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা ভবিষ্যতের প্রজন্ম ও গবেষকদের প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক হবে।

মেলার দর্শক সংস্কৃতি ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬, এ (কে এম মুজ্জাম্মিলুল হক) যাতে দেখা গেছে (১) স্থানীয় দর্শক (ক) স্থানীয় গ্রামীণ দর্শক (খ) স্থানীয় নাগরিক দর্শক (২) নাগরিক দর্শক (ক) নাগরিক মধ্যবিত্ত দর্শক (খ) নাগরিক উচ্চবিত্ত দর্শক (৩) বিদেশী দর্শক (৪) ভবঘুরে দর্শক (৫) জ্ঞানী দর্শক/গবেষক দর্শক (৬) শিশু দর্শক-ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার দর্শকের উল্লেখ করেছেন-যার বাইরেও আরও দর্শক থাকতে পারে। লোক মেলার গবেষণার প্রেক্ষাপটে দর্শক সংস্কৃতির বিষয়ে এ ধরণের গবেষণা নানা অজানা তথ্য উদঘাটিত করবে।

লোক মেলার প্রসারে লোকজ উৎসব ঃ প্রেক্ষিত লোকজ উৎসব '৯৬ প্রবন্ধে জসিমউদ্দিন ফাউণ্ডেশনের লোকজ মেলাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব যেমন বাউল গান, কবিগান, ভাটিয়ালী, গাজনের গান, গাজীকালু চম্পাবতী, সত্যপীরের গান, যাত্রা, কীর্তন, আলকাপ গান, গম্ভীরা গান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নাগরদোলা, চড়ক গাছ, লাঠিখেলা, কুস্তি, দোক খেলা, নানা ধরণের মিষ্টি, মোয়া, মুড়ি মুড়কি, জিলাপী এই মেলাকে উৎসব মুখর করেছে, তার বর্ণনা প্রবন্ধকার দিয়েছেন। লোক মেলার প্রসারে এ মেলাকে উৎসব মুখর করতেই এ সবের প্রয়োজন।

লোকজ খেলার স্বাজাত্যদর্শন এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মধারাঃ প্রেক্ষিত লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬, (মোঃ রবিউল ইসলাম) এতে সোনারগাঁ মেলায় ১৯৯৪-১৯৯৫ পর্যন্ত যেসব গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন যা গবেষকদের কাজে লাগছে-আবার সাংস্কৃতিক পূনরুজ্জীবনে যারা উৎসাহী তাদেরও প্রেরণাজোগাবে।

মেলার সেমিনার প্রসঙ্গঃ লোকজ সংস্কৃতির স্থায়ী বিস্তারে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, দিলরুবা বেগম প্রবন্ধে সেমিনার গুলিকে লোকসংস্কৃতির বিস্তারে ও গবেষণা পরিচালনায় অবদান রাখতে পারবে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই সেমিনার শুধু আলোচনার জন্যই আলোচনা ঠিক তা নয়, এর উদ্দেশ্য এর পরিকল্পনা অত্যন্ত বাস্তবমুখী, ডকুমেন্টেশন করে একে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে সারাবিশ্বে পৌঁছে দেয়া যাবে।

আমাদের বক্তব্যও তাই। সমগ্র বিশ্বেই আজ স্বাধীনতাও স্বাজাত্য বোধের অভিজ্ঞান হিসাবে লোকজীবন, তার উৎসব অনুষ্ঠান বিশেষ করে এর লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হচ্ছে। জাতি যাতে বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসনে বা অপসংস্কৃতির চাপে নিজস্ব ঐতিহ্যকে ভুলে না যায়-যদি এমন কিছু ঘটে তবে জাতি আর জাতি থাকে না। এসব ভিডিও এবং ডকুমেন্টেশন ডাবিং এর মাধ্যমে আমাদের বিদেশী দুতাবাস এবং সেখান থেকে বিশ্বের বিভিন্ন যাদুঘরে পৌঁছে দেশকে করতে পারে আরও শ্রদ্ধার। দেশের স্পষ্ট পরিচিতি ফুটে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক গবেষকদের মূল্যবান গ্রন্থে একটি মিনি বাংলাদেশ রূপে-এসব প্রতিবেদন সে বিচারেও গুরুত্বপূর্ণ।

দেশাত্মবোধ, ঐতিহ্য প্রীতি, বিশ্ব-জাতি-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রম পর্যায়-যা নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সংস্কৃতিতত্ত্ব-সবকিছুরই কেন্দ্রমূলে যা জানার জন্য বিশ্ব সমাজ ও লোকবিজ্ঞানীদের একান্ত আগ্রহ, যা দেখার ও জানার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে বিপুল অর্থ-যা নিয়ে পাঠক্রম তৈরী হচ্ছে বিশ্বের বহুবিশ্ববিদ্যালয়ে-যার নাম হতে পারে Bangladesh Study ও যা বিশ্বের কাছে দেশকে পরিচিত করতে পারে প্রতিদিন, যা শত রাজনৈতিক বক্তব্য ও বক্তৃতায়ও সম্ভব নয়-তাই দিতে পারে জয়নুলের স্বপ্ন-এই সোনারগাঁ ফাউণ্ডেশন। এই সব প্রতিবেদন সেই দিগন্তেই আলো ফেলবে-এমনি বাংলাদেশকে দেখে-সমগ্র বাংলাদেশও হবে গর্বিত।

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য

মোঃ ইয়ামিন খান
গাইড লেকচারার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

প্রাসঙ্গিক আলোচনাকে গতিশীল এবং গভীর করার আগে লোকমেলা কি এবং কেন আয়োজিত হয়ে থাকে সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। এই উপমহাদেশ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেলা হতে দেখা যায়, অর্থাৎ এর প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করা মানুষের সহজাত স্বভাব। আর তাই সামাজিক পরিমন্ডলে আবহমান কাল থেকে মানুষ স্বেচ্ছায় পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হচ্ছে বা হয়ে আসছে। এভাবে পরস্পর মিলনের রেওয়াজ বা প্রচলন থেকেই সম্ভবত মেলার উদ্ভব হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন। আবার কেহ কেহ অনেক লোকের একত্রে মিলন স্থলকে মেলা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বর্তমানে মেলা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে। শুধু মাত্র মানুষের মিলনস্থলকে মেলা বলা যায় না। সেই সাথে থাকবে খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পপণ্যের সমাগম, থাকবে বেচাকেনার পরিবেশ এবং সর্বোপরি আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা। এক কথায় খাদ্যদ্রব্য এবং নানা শিল্পপণ্য ক্রয় বিক্রয় ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ স্থানে সমাগত মানুষের মিলনকে মেলা বলা যায়।

মেলা সাধারণত কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে, কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় উৎসব, কোন বিশেষ দিন, অথবা বর্ষবরণ, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণে অথবা নবান্নের উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এ সকল মেলার স্থায়ীত্ব সাধারণত কোনটি একদিন, কোনটি এক সপ্তাহ এবং কোনটি এক পক্ষকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। এ সব মেলা ছিল এক সময়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাণশক্তি। দেশের কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প এবং কৃষিজ শিল্প উল্লেখযোগ্য হারে এ মেলাগুলোতে প্রদর্শিত হতে দেখা যেতো। দূর দূরান্ত হতে, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকেও বহুলোক, কারিগর, শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের পণ্য কেনা বেচার জন্য সমাগত হতে দেখা যায়। যেমন লাঙ্গলবন্দ অষ্টমী স্নানের মেলা। কৃষি ভিত্তিক গ্রাম বাংলার অর্থনীতির বুনিয়াদ সৃষ্টি হয় কৃষকের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য থেকে। অর্থাৎ নতুন ধান চাষী এবং গৃহস্থের ঘরে উঠলে তৈরী হতো মেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। দেখা গেছে, যে বৎসর প্রচুর ধান ফলেছে, সে বৎসর মেলাও জমেছে দ্বিগুণ উৎসাহে। আবার কোন কোন মেলা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো, আউল-বাউলদের সমাবেশের কারণে। বাউলরা নাচ গান করে রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত জেগে থাকত, আর তাদের ঘিরে সমাগত হাজারো দর্শক-শ্রোতা গানের মধ্যে তাঁদের আধ্যাত্ম প্রেরণার উৎস খুজতো।

বাংলাদেশের লোক মেলার নব্বই শতাংশ ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকত। এবং বাকী দশ শতাংশ উল্লেখিত অন্যান্য সকল কারণকে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সুতরাং এ সকল মেলার গুরুত্ব অনেক। মেলা মূলত একটি প্রতিষ্ঠান, এখানে পণ্যের প্রতিযোগিতা আছে বলে নির্মাতার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রেরণা জাগে। এর সাথে প্রযুক্তির লেনদেনও ঘটছে প্রতিনিয়ত, ফলে মেলা এখন বিস্তৃত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী, উদ্ভাসিত হচ্ছে নতুন নতুন নামে, যেমন-শিল্প মেলা, বাণিজ্য মেলা, ইত্যাদি। এর ধারাবাহিকতা বিশ্ব বাণিজ্য অর্থনীতি প্রসারের পথকে করছে প্রশস্ত এবং সুসংহত।

আবহমান বাংলার লোক সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে মেলা। ফলে লোকমেলার ঐতিহ্য আবহমান কাল হতে আজ অবধি বহতা নদীর মতই আপন ধারায় প্রবহমান এবং সক্রিয়। বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং পরিবেশদ্বারা প্রভাবিত সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের আচার-অনুষ্ঠান পালা-পার্বণ জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আনন্দ বিচ্ছেদ, সকল কিছুতেই এদেশের চিরন্তন লোক বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। লোক মেলা হচ্ছে তারই একটি অনুষঙ্গ মাত্র। সার্বজনীন আনন্দই মেলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। গ্রাম বাংলার লোক মেলা আজ অবধি সেই চিরন্তন অনিন্দ্য সুন্দর ধারায় প্রবহমান।

মেলার প্রধান গেটের সাজসজ্জায় হাতীর দৃশ্য

বিশ্ব বরেণ্য শিল্পী প্রয়াত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে এ দেশের লোক সংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, তথা পুনরুজ্জীবনের মূল মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। আর লোক মেলা হচ্ছে লোকসংস্কৃতির একটি অনুষঙ্গ। কাজেই লোকসংস্কৃতির বহমান ধারাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিবছর লোক মেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করে থাকে। কারণ একটি আর একটির পরিপূরক।

তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সোনারগাঁয়ে প্রতিবারের মত এবারও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তার নিজস্ব আঙ্গিনায় আয়োজন করেছে লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬। বাংলার হাজার বৎসরের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা প্রায় বিলুপ্ত, অর্ধবিলুপ্ত সেই সকল সংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন তথা পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এই ফাউন্ডেশন। লোকশিল্প এবং সংস্কৃতির প্রসার ও বিস্তারের লক্ষ্যে লোক মেলার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে চলেছে এই ফাউন্ডেশন। মেলার সাথে সংযোজিত হয়েছে উৎসব। উৎসব কথাটি শুনলেই মনের মধ্যে কেমন একটা আনন্দের অমিয় ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। আর তাই বোধ হয় লোক মেলার সাথে লোকজ উৎসবের সংযোজন মাসব্যপী এ আয়োজনকে দিয়েছে সার্থক সজীবতা।

আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার আগে যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে, যে কোন উৎসব বা আয়োজন সার্থক রূপায়নের মূল শর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, দুরদৃষ্টি, এবং সর্বোপরি একাগ্রতা। সে দিক থেকে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ ছিল এর যথার্থ সমন্বয়।

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬-এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি এসে যায়, তা হচ্ছে এর আয়োজন, সৌন্দর্য সৌষ্ঠব, এবং ষোলকলায় পূর্ণ একটি চিত্রিত রূপ। ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে মার্চ ১৯৯৬ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ব্যাপী লোক মেলা ও উৎসব আয়োজনকে সার্থক রূপদানের প্রচেষ্টাই মূলতঃ লোকমেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬কে দিয়েছে এর যথার্থ সার্থকতা। প্রতিবারের মত এবারও লোক মেলা ও লোকজ উৎসবকে কেন্দ্র করে ষোলকলায় সাজানো হয়েছে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তথা মেলার অঙ্গন।

বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবারের সাজসজ্জা ছিল একটু ভিন্নধর্মী। লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে কারুপল্লী পর্যন্ত এই দীর্ঘ স্থানটি বিচিত্র রঙের ব্যানার, ফেষ্টুন, শ্লোগান, লোকমটিফ, এবং ফাউন্ডেশনের মনোগ্রাম সম্বলিত পতাকা দিয়ে অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সাজানো হয়েছে। তাছাড়া ফাউন্ডেশন চত্বর জুড়ে ছিল চমৎকার আলোক সজ্জা। সব মিলিয়ে একে তিলোত্তমা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, এক মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গমস্থলে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের অবস্থান। একে আরও বেশী আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানা শৈল্পিক উপকরণ দিয়ে স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে গোটা লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তথা মেলার অঙ্গন, যা মুহূর্তের জন্য হলেও এখানে আগত দর্শকদের পুলকিত বা উদ্বেলিত না করে পারেনি।

বর্ণনার শুরুতেই বলতে হয়, লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর প্রধান আকর্ষণ ছিল আলোক সজ্জা। মন মাতানো এবং চোখ ধাঁধাঁনো রঙ বেরঙের আলোর ছটা গোটা মেলা এবং উৎসব পরিবেশকে করেছে প্রাণোজ্জ্বল। অনাদিকাল হতেই আলোর প্রতি মানুষের অদম্য আকর্ষণ যুগে যুগে ধাপে ধাপে সভ্যতার সোপান বেয়ে এগুবার পথকে করেছে প্রশস্ত। যেখানে আলো সেখানেই মানুষের প্রশস্তি। আর তাই আলো আর আধারের মধ্যে পার্থক্য রচিত হয়েছে, পার্থক্য রচিত হয়েছে তেমনি সুখ আর দুঃখ বোধের। আলো চিরকাল মানুষকে অনুরণিত করে আপন মহিমায়, আকৃষ্ট করে মানুষের মন। সে কারণেই বোধ হয় লোক মেলা এবং লোকজ উৎসব'৯৬ এর আলোকসজ্জা আকৃষ্ট করেছিল হাজারও দর্শক শ্রোতাকে। তাঁরই অনিবার্য আকর্ষণে প্রায় প্রতিদিন হাজারো দর্শক শ্রোতাকে সমাগত হতে দেখা যায়।

লোকমেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর সাজসজ্জায় এবারের সবচাইতে আলোচিত একটি ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী চোখে পরে ফাউন্ডেশনের প্রধান ফটক থেকে প্রায় পঁচিশ

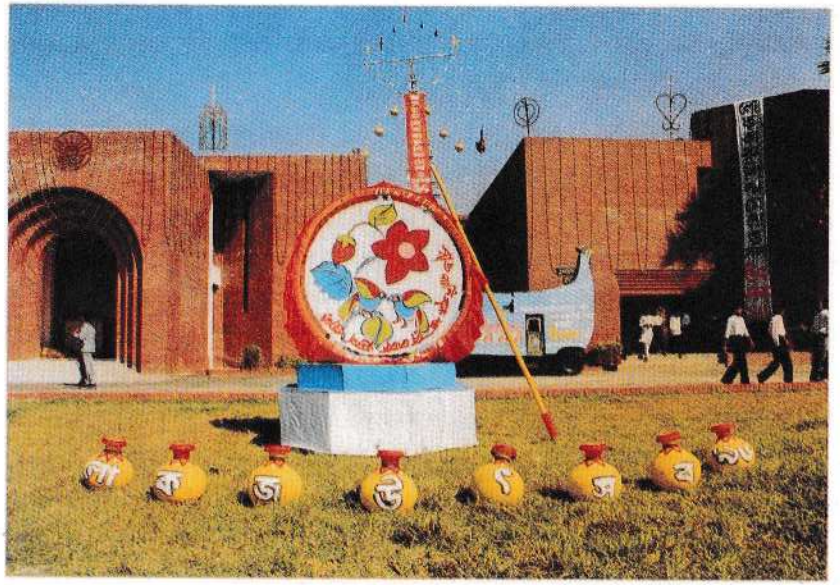

মেলা'৯৬এর সাজ সজ্জায় ফাউন্ডেশনের মূল ভবনের সামনে আইল্যান্ডে বৃহৎ নক্শী পাখা

গজ দূরে। প্রদর্শনীটি ছিল রাস্তার দুপাশে রক্ষিত দুটি বিশালকায় হাতী। বাঁশ আর রঙ্গীন কাগজ দিয়ে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তৈরী করা হয়েছে এই হাতী দুটি। লোকমটিফে তৈরী এই হাতী দুটিতে বিভিন্ন রঙের নকশা কাটা ঝালড়ের ব্যবহার একে বৈচিত্র্যমন্ডিত করে তুলেছে, যা স্বভাবতই শিল্পপ্রাণ মানুষের মনকে আকৃষ্ট না করে পারেনা। ভূতাত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান। এ দেশের মোট ভূ-ভাগের প্রায় পঁচাশি শতাংশ পলল গঠিত সমভূমি অবশিষ্ট পনের শতাংশ টিলা বা পার্বত্য অঞ্চল। এই পার্বত্য অঞ্চলের গভীর বনভূমিতে হাতী দেখতে পাওয়া যায়, ফলে বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের কাছে এই বিশাল প্রাণীটি বহুল পরিচিত নয় বিধায় স্বাভাবিক কারণেই এটি এই অঞ্চলের মানুষকে আকৃষ্ট করে। প্রদর্শিত হাতী দুটি ছিল এ অঞ্চলের একটি উৎকৃষ্ট খেলনার প্রতিকৃতি।

শিল্প হচ্ছে মানুষের নান্দনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতির অপূর্ব শৈল্পিক পরিবেশের চারণ ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত লালিত হচ্ছে। কাজেই প্রকৃতিগত কারণেই এদেশের অধিকাংশ মানুষ শিল্পবোধ সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর তাই শিল্প এবং শিল্পের অবারিত ধারা অনিবার্য ভাবেই ছুঁয়ে যায় এদেশের মানুষের অন্তর। এ দেশের লোকশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আলপনা। এ দেশের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে এই শিল্পের ব্যবহার সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আলপনা ছাড়া যেন কোন আচার অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এর সৌন্দর্য আমাদের কাছে চিরন্তন। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর সাজ সজ্জায় তাই এই মাত্রাটিও বাদ যায়নি।

বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং পরিবেশই মূলতঃ এদেশের লোকশিল্পের কাঁচা মাল যোগান দেয়। ফলে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বাঁশ আর বেত দিয়ে বহু প্রাচীন কাল থেকে তৈরী হচ্ছে নানা ধরনের লোক পণ্য। বাঁশ ও বেতের ডালা এবং কুলাও তেমনি মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে এক সময় তৈরী করতো, গৃহস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে। তার পর এক সময় মানুষ প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে শৈল্পিক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে এতে আঁকে নানা রঙের প্রলেপ, তৈরী হয় সাজাবার উপকরণ। আর তাই এবারের মেলাতে আলপনা অত্যন্ত রুচিকর সাজসজ্জা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

হাতী দুটো থেকে প্রায় পাঁচগজ অন্তর অন্তর রাস্তার দুপাশে আলপনা অঙ্কিত ডালা এবং কুলা দিয়ে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত অত্যন্ত মনোরম ভাবে সাজানো হয়েছে। এর পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত রয়েছে ফুলের বাগান। রাস্তার দুপাশের সারিবদ্ধ ফুলের বাগানের পাশ দিয়ে সাজান ছিল ফাউন্ডেশনের মনোগ্রাম সম্বলিত নানা বর্ণের পতাকা। শিল্প আর প্রকৃতি যেন একাত্ম হয়ে মিশে গেছে এখানে ফলে গোটা পরিবেশে এনেছে এক স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য, যা এখানে সমাগত দর্শককে আন্দোলিত এবং বিমোহিত করেছে।

প্রশাসনিক ভবনের ঠিক সামনের গোল চক্করটিতে রক্ষিত বিশাল নকশী পাখাটি শাশ্বত বাংলার শৈল্পিক রূপকে মনে করিয়ে দেয়। গ্রাম বাংলার কোন ষোড়শী, উর্বশী ফুল, পাতা আর পাখীর মটিফ দিয়ে যেন বানিয়েছে এই পাখাটি। পাখাটিতে যেন তার ব্যথাতুর হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার করুণ আরতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিজের অজান্তেই সে তার প্রবাসী বন্ধুর উদ্দেশ্যে কল্পনার পাখীকে আপন মনে বলছে - "যাও পাখী বল তারে, সে যেন ভুলেনা মোরে" এমনি হাজার আকুতি, শাশ্বত জীবনের সংলাপ আমরা এই নক্শী পাখাগুলোতে দেখতে পাই।

পাখার ব্যবহার আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এই পাখাগুলোর শৈল্পিক সৌন্দর্যও অপরিসীম। অঞ্চল ভেদে এই সকল পাখাগুলোতে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার হতে দেখা যায়। যে অঞ্চলে তাল গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে, সে অঞ্চলে তালপাতার পাখার ব্যবহারও অধিক পরিমাণ দেখা যায়। তেমনি যেখানে খেজুর গাছ বেশী জন্মে সেখানে খেজুরের পাতা দিয়ে বুনানো পাখা ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাছাড়া বাঁশের তৈরী পাখা এদেশের প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার হতে দেখা যায়। তবে অঞ্চল ভেদে এই পাখার গঠন শৈলীর তারতম্যও পরিলক্ষিত হয়। এর পর সভ্যতার উৎকর্ষের সাথে সাথে পাখা শিল্পেও এক নতুন বৈচিত্র্যের মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। নানা বর্ণের

মেলায় আগত দর্শকদের একাংশ

কাপড়ের মধ্যে এ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে মটিফ সংগ্রহ করে সুই ও বিভিন্ন রঙের সুতার ব্যবহার করে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় পাখা বানাতে দেখা যায়। এছাড়া কাপড়ের পাড় থেকে সুতা বের করে সেই সুতাদিয়ে বুনিয়ে বৈচিত্র্যময় পাখা তৈরীও বহুল প্রচলিত। এ ছাড়াও গোল চক্করটির চার দিক ঘিরে রয়েছে নকশী হাঁড়ির সাজ সজ্জা।

প্রশাসনিক ভবন এবং নতুন যাদুঘরের মাঝা মাঝি জায়গায় ঝুলানো একটি বিশাল লক্ষীসরা মনে করিয়ে দেয় মৃৎশিল্পের শৈল্পিক সৌকর্যের ইতিহাস, যা এখন বিস্মৃতির জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবহমান ধারায় গা ভাসিয়ে দেয়া মানুষের কাছে এর ব্যাবহারিক গুরুত্ব কমলেও এর শৈল্পিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব যে কমেনি তা একটু পরখ করলেই বোঝা যায়। প্রশাসনিক ভবনের ছাদেও রয়েছে একটি বিশাল প্লাটফর্ম,। প্লাটফর্মটির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রয়েছে লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ খচিত ব্যানার। উপর থেকে দুপাশে ঝুলানো রয়েছে দুটি করে চারটি নকশী হাঁড়ি। এ ছাড়া ফাউন্ডেশনের মনোগ্রাম সম্বলিত নানা রঙের পতাকা সুশোভিত রয়েছে এই প্লাটফর্মটিতে। বাঁশের তৈরী এই বিশাল প্লাটফর্মটির প্রতিটি অংশ নানা রঙদিয়ে নিপুণভাবে সাজান হয়েছে, যা বহুদূর থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। রঙ আর বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্যকরা যায় এই প্লাটফর্মটিতে। এ ছাড়াও ফাউন্ডেশনের বিশাল চত্বর জুড়ে সর্বত্রই ছিল শৈল্পিক সমাবেশ।

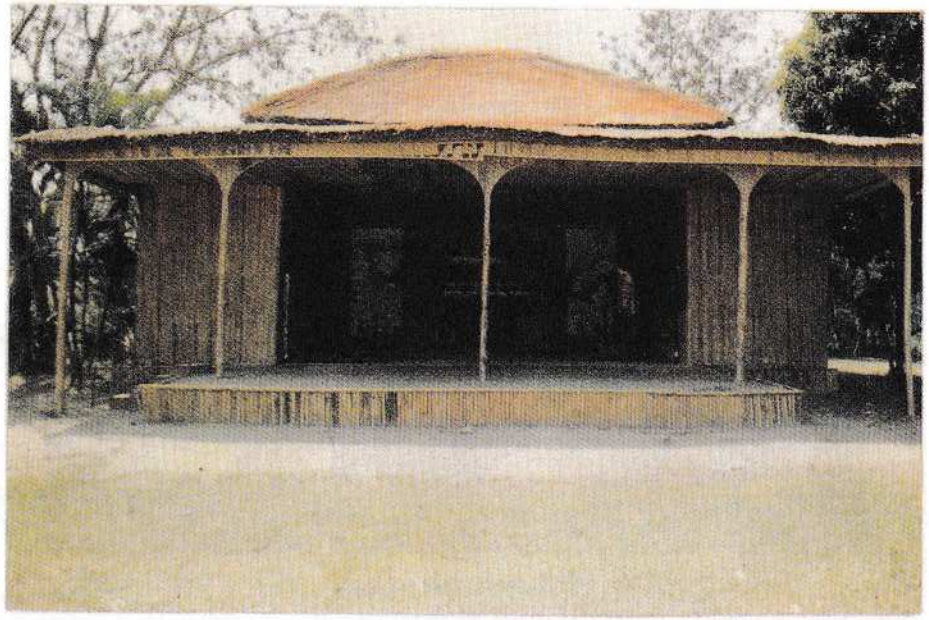

ছন ও বাঁশের তৈরী লোক মঞ্চ

ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরীর ঠিক দক্ষিণ দিকে গ্রামীণ খেলার মাঠটি ছিল বর্ণাঢ্য ক্যানভাসের ফেস্টুন দিয়ে সজ্জিত। এই ফেস্টুনগুলোতে গ্রামীণ খেলার তথ্য ভিত্তিক শ্লোগান এবং গ্রামীণ খেলার বিভিন্ন মটিফই ছিল মাঠের বিশেষ আকর্ষণ, যা এখানে সমাগত দর্শকদের আবহমান বাংলার প্রায় বিলুপ্ত বা অর্ধবিলুপ্ত খেলাধুলার শৈল্পিক কৌশলের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্য নিয়ে যায় কোন সুদূর অতীতে, যেখানে এমনি কোন খেলায় অবগাহন করে কেটেছে শৈশব আর কৈশর। স্মৃতি রোমন্থনের এই অকৃত্রিম প্রচেষ্টাই ফাউন্ডেশনের এই আয়োজনকে দিয়েছে সার্থকতা। লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ উপলক্ষ্যে বিলুপ্তপ্রায় দশটি ভিন্ন ধরণের লোকজ খেলা প্রদর্শিত হয়েছে এই মাঠে। হাজার দর্শক চৈতি খররদ্দুর উপেক্ষা করে প্রাণভরে উপভোগ করেছেন এই খেলাগুলো।

লোকজ খেলার মাঠের পূর্ব দিকে ছিল জীবন্ত প্রদর্শনীর মঞ্চ। এই প্রদর্শনী মঞ্চের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মে প্রদর্শিত হয়েছে পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রদর্শনী। প্রত্যেকটি প্লাটফর্মের পেছনে ১৬' × ১০' সাইজের একটি করে লোকান্তার অনুষ্ঠানের মটিফ সম্বলিত ক্যানভাসের ফেস্টুন ছিল। এবারের জীবন্ত প্রদর্শনীর বিষয় বস্তুছিল (ক) মেয়েদের আলতা পড়ানো (খ) বিয়ে পড়ানো (গ) গ্রাম্য বিচার (ঘ) রাখালের বাঁশী বাজানো (ঙ) মুড়ি ও খই ভাজা। এই প্রদর্শনীগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিল স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খুবই চমৎকার ভাবে এই প্রদর্শনীগুলো পরিবেশন করেছিল। জীবন্ত প্রদর্শনীগুলো ছিল জীবন কেন্দ্রিক লোক মানুষের আচার অনুষ্ঠানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সেই সাথে ছিল প্রত্যেকটি আচার অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির বাস্তব প্রচেষ্টা, ফলে প্রত্যেকটি প্রদর্শনী হয়েছিল উপভোগ্য। বিমুগ্ধ দর্শককে প্রত্যেকটি প্রদর্শনী তন্ময় হয়ে উপভোগ করতে দেখা যায়।

পাঠাগারের দুপাশের দেয়ালে অঙ্কিত মুরাল দুটি লোক মেলা এবং লোকজীবনের প্রতিচ্ছবিকে শিল্পী উপস্থাপন করেছে। পাঠাগারের দক্ষিণ পূর্ব পাশে বর্ণাঢ্য দুটি নাগর দোলা ছিল প্রকৃত মেলার ছবি, আর মেলায় আগত শত শত প্রাণোচ্ছল শিশু, কিশোর এবং কিশোরীদের আনন্দের উৎস।

খেলার মাঠ এবং জীবন্ত প্রদর্শনীর মঞ্চ এ দুয়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকে চলে গেছে পায়ে চলা সর্পিল পথ, এই পথ ধরে প্রায় পঁচিশ গজ সামনে এগুলেই চোখে পরে সুবিশাল লোক মঞ্চ। এই মঞ্চ থেকে প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোক শিল্পীরা এসেছেন এখানে। লোক নাটক, পরিবেশ প্রদর্শনী, গল্পবলাসহ, জারীগান, পালাগান, মুর্শিদী গান ইত্যাদি নানা লোক সঙ্গীত প্রায় প্রতিদিন পরিবেশিত হয়েছে এই মঞ্চ থেকে। হাজার হাজার দর্শককে সমাগত হতে দেখা গেছে এই সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। কখনও কখনও উপচে পড়া দর্শক, শ্রোতা বসার জায়গা না পেয়ে পাশ্ববর্তী গাছে উঠে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা গেছে। এখানকার সকল অনুষ্ঠান এতই জীবন ঘনিষ্ঠ ছিল যে, হাজার হাজার দর্শক শ্রোতাকে প্রতিদিন প্রাণভরে উপভোগ করতে দেখা যায় এই সকল অনুষ্ঠান। উৎসুক

দর্শক শ্রোতারা তাঁদের জীবনের আনন্দ-বেদনা হাসি-রস, এমনকি আধ্যাত্ম প্রেরণার উৎস খুঁজে ফিরত এ সকল অনুষ্ঠান গুলোর মধ্যে। সে কারণেই লোকমেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই লোক মঞ্চ। তা ছাড়া এই লোকমঞ্চের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ মঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে বাঁশ এবং ছন দিয়ে তৈরী। অথচ এত পরিকল্পনা প্রসূত এবং সৌন্দর্যমন্ডিত যা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এই উপ-মহাদেশ তথা এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি স্থানে মঞ্চ সজ্জায় বাঁশ এবং ছনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তবে এত বৈচিত্র্যমন্ডিত মঞ্চ পৃথিবীর আর কোথায়ও আছে বলে মনে হয় না। সে কারণে এটি যেমন দর্শক নন্দিত হয়েছিল, সমধিকভাবে নন্দিত হয়েছিল শিল্পীদের কাছেও।

কারণ এই মঞ্চটি ছিল কারুশিল্পের একটি নান্দনিক নিদর্শন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বৈচিত্র্যময় ছনের ঘর দেখা যায়। এর কোনটি দোচালা, কোনটি চার চালা, কোনটি আবার ছয়চালা, সাতচালা এমনকি আট চালাও দেখা যায়। এগুলো যেমন সৌন্দর্যমন্ডিত, তেমনি এর ব্যবহারিক গুরুত্বও অনেক। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন নির্মিত মঞ্চটি ছিল সাত চালা ছনের ঘরের প্রতিকৃতি।

চোখ ফেরানো যাক কারুপ্রদর্শনীর মঞ্চে। লোক মঞ্চ থেকে একটু সামনে, যেখানে মেলার আয়োজন করা হয়েছে তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নির্মিত বিশাল মঞ্চটিই ছিল কারুপ্রদর্শনীর মঞ্চ। এটি ছিল এ যাবৎ কালের আয়োজনের মধ্যে একটি ব্যাতিক্রমী আয়োজন। এ মঞ্চে যে প্রদর্শনীগুলো মূলতঃ স্থান পায় তা ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রকমারি দৈএর হাঁড়ি। এই দৈএর হাঁড়ি যে এত বৈচিত্র্যময় হতে পারে তা চোখে না দেখলে বুঝবার উপায় নেই। এরপর মঞ্চের পূর্ব দিকে রয়েছে কারুফ্রেম প্রদর্শনী। ফাউন্ডেশনের উদ্ভাবিত অতিতুচ্ছ লোক উপকরণ দিয়ে এই সকল ফ্রেম তৈরী করা হয়েছে। শৈল্পিক স্পর্শে এগুলো শুধু আকর্ষণীয়ই ছিল না ছিল উপভোগ্যও। পাশাপাশি কিভাবে এই ফ্রেমগুলো তৈরী হচ্ছে তারও প্রদর্শনী ছিল এই মঞ্চে। এর পর রয়েছে রকমারি নকশী হাঁড়ি বা সখের হাঁড়ির প্রদর্শনী। সখের হাঁড়িতে ব্যবহৃত রঙ এবং নকশা গুলো ছিল চিত্তাকর্ষক। মঞ্চের পশ্চিম দিকের প্রদর্শনীতে ছিল অত্যন্ত চমৎকার দুটি নকশী বেড়া। বাঁশবেত শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন ছিল এ দুটি বেড়া, সব মিলিয়ে কারু প্রদর্শনীর মঞ্চটি ছিল শৈল্পিক সুষমায় সুশোভিত। মেলায় আগত দর্শকগণকে ভীড় করে এই প্রদর্শনীগুলো উপভোগ করতে দেখা যায়।

মেলার মাঠের পশ্চিম দিকের লম্বালম্বি মঞ্চটি ছিল আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মঞ্চ। এতে লোকজ খেলা-ধূলা, জীবন্ত প্রদর্শনী সহ বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠানের ষাটটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। শত শত লোককে অত্যন্ত উৎসাহ ভরে এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি উপভোগ করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে কারুপল্লী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবহেলিত অথচ দক্ষ লোকশিল্পীদের কর্মের পুনর্বাসন তথা শিল্পী ও শিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে আজ অবধি লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছে। ছোট বড় মোট বিশটি স্থায়ী ষ্টল রয়েছে। এখানে চারটি উল্লেখযোগ্য শিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীদের কর্মের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই শিল্পগুলো যথাক্রমে মৃৎশিল্প, তাঁত বা জামদানী শিল্প, পাটজাত শিল্প এবং কুটিরশিল্প। এই সমস্ত শিল্পীরা নিজ হাতে শিল্পপণ্য তৈরী করে বিক্রয় করে থাকে। সে কারণে মেলা উপলক্ষ্যে এখানে প্রচুর দর্শকের সমাগম দেখা যায়। এ ছাড়াও এই স্থানটি জুড়ে নানা রঙের পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন এবং দুটি ভিন্ন ধরণের প্লাটফর্ম দিয়ে স্থানটি উৎসব মুখর করে তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি গোটা স্থানটি জুড়ে আলোক সজ্জা ছিল বিশেষ লক্ষ্যণীয় দিক।

স্বাধীনতাপূর্ব কালে এদেশের হাজার বৎসরের পুরানো লোকশিল্পের উৎকর্ষ, বিকাশের কোন সুনিশ্চিত প্রক্রিয়া ছিল না। ফলে এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের উৎকর্ষ, বিকাশের পথ কখনও উন্মোচিত হবার প্রয়াস পায়নি। বরং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে প্রতিনিয়ত হয়েছে বাধাগ্রস্থ। স্বাধীনতাউত্তর কালে এ দেশের স্বর্ণ সন্তান, সংস্কৃতির পুরধা এবং বিশ্ব বরেণ্য শিল্পী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এই চরম ক্লান্তিকর মুহূর্তে এদেশের লোক শিল্পের ঐতিহ্যকে অবক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা করে লোক শিল্পের স্বকীয় ধারায় প্রবাহিত করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদেশের হাজার বছরের লালিত লোক ঐতিহ্যের অকৃত্রিম ধারার সৃষ্টি লোক শিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের কাজ চলবে। এবং এই চিরায়ত শিল্পের উৎকর্ষ ও বিকাশের পথ হবে অবারিত। তিনি স্বপ্ন দেখেন এখানে একটি শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে কাজ করবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপরিচিত অথচ দক্ষ শিল্পীরা। তার এই স্বপ্নের যথার্থ রূপায়ন হয়েছিল ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্য দিয়ে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের আওতায় ১৫০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং এই বিস্তৃত ভূখন্ডে একটি সংশোধিত মাষ্টার প্লান অনুযায়ী এদেশের ভৌগলিক পরিবেশ ও শাশ্বত গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উল্লিখিত চারটি মৌলিক কর্মসূচীকে ফাউন্ডেশনের সংশোধিত মাষ্টার প্লানে সংযোজন করে তার স্থান চিহ্নিত ও নির্ধারণ করা হয়। কমিটি একটি সংশোধিত মাষ্টার প্লান প্রণয়ন করে এবং সে নিরিখে একটি পরিকল্পিত নকশা সম্বলিত ম্যাপ তৈরী করা হয়। সংশোধিত মাষ্টার প্লানে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পনের বৎসর মেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হলে এর সুষ্ঠু উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে, এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নের মৌলিক ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে লোকজ উৎসব ও মেলা। সংগত কারণেই বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এর ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ফাউন্ডেশন

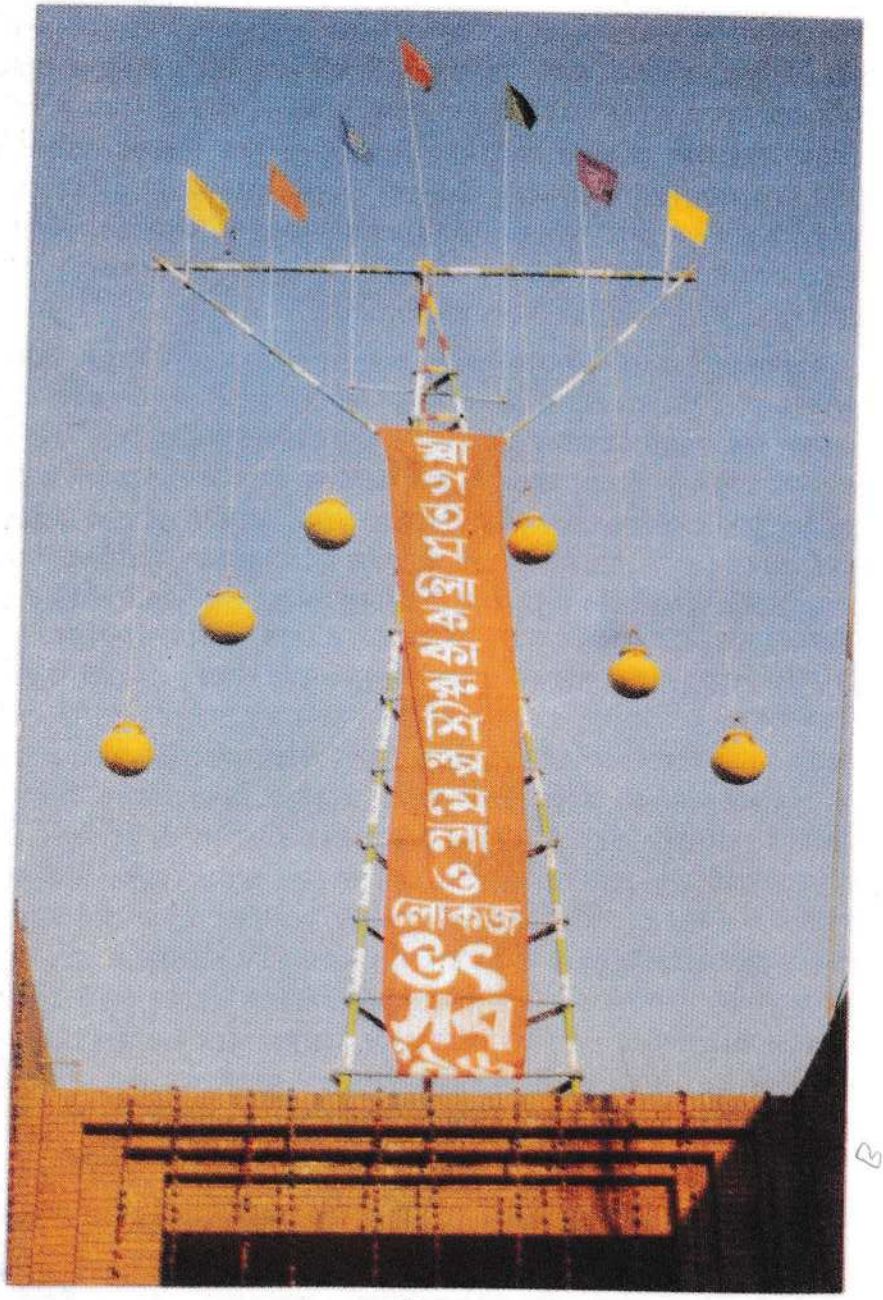

লোকজ টাওয়ারের দৃশ্য

আয়োজিত লোক মেলা ও উৎসব এখন গবেষণাকেন্দ্রিক হয়ে আসছে। এবারের লোক মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। কাজেই ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক মেলা ও লোকজ উৎসব আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ লোক মেলা সাদৃশ্য হলেও এর কতগুলো সাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর প্রেক্ষাপট বর্ণনায় যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলো চোখে পড়ে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) এটি একটি দীর্ঘ সময় ব্যাপী আয়োজিত মেলা যা বাংলাদেশের যে কোন মেলার তুলনায় দীর্ঘকালীন এবং বৃহত্তম। ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন বার্ষিক লোক মেলা ও উৎসবের আয়োজন করে আসছে। বিগত মেলাগুলো ছিল স্বল্পকালীন, যার স্থায়ীত্ব ছিল দুই দিন, অথবা তিন দিন, এবং সপ্তাহে একদিন করে দুই মাস। কিন্তু ১৯৯৫ সাল থেকে এটি মাস ব্যাপী একটানা আয়োজনে দীর্ঘকালীন মেলার রূপরেখায় উদ্ভাসিত হয়েছে। যা ছিল এ যাবৎ কালের লোক মেলার ইতিহাসে একটি বিরল দীর্ঘকালীন মেলা। নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত একটানা একটি স্বার্থক দীর্ঘকালীন মেলার আয়োজন করেছে।

(২) এবারের লোকজ উৎসব ও মেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক শিল্পী এবং লোক শিল্পের সাথে জড়িত আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত হয়েছে।

(৩) মাস ব্যাপী মেলা ও উৎসবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নানা লোক সংগীত শিল্পীর আগমন ঘটেছে। এবং তাঁদের পরিবেশনায় মাস ব্যাপী বিভিন্ন লোক সংগীত পরিবেশিত হয়েছে। এতে করে লোক সংগীতের আদি ধারার বিবর্তন বা রূপান্তরের প্রক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়েছে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের পরিবেশিত গানের মধ্যে। এবারে সর্বাধিক সংখ্যক লোক শিল্পীদের আগমনে ফাউন্ডেশন ছিল উৎসব মুখর।

(৪) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক মেলা ও লোকজ উৎসবের উৎসবমুখীতাই কেবল এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এটি গবেষণাধর্মী। লোকশিল্প, সংগীত, খেলাধুলা এবং আচার অনুষ্ঠানের অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা বিশ্লেষণও ছিল এর উল্লেখযোগ্য দিক। ফলে এবারের মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে এই সংক্রান্ত পাঁচটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। যেমন ঃ (ক) লোকজ খেলার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। (খ) জামদানীর অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। (গ) মৃৎশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। (ঘ) পাটজাত কারুপণ্যের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। (ঙ) নকশী কাঁথার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। এবং (চ) লোকজ ঐতিহ্যের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। দেশের বিশিষ্ট, সাহিত্যিক, সাংবাদিকও

বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এই সেমিনারগুলো ছিল প্রাণবন্ত। তাদের প্রণীত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং আলোচনা এ প্রজন্মের কাছে আলোর দিশারী এবং পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

(৫) লোকশিল্পের উৎস হচ্ছে এদেশের গ্রাম এবং গ্রামীণ পরিবেশ। আর এই পরিবেশই লোকশিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্লাটফর্মের মাধ্যমে এ দেশের হাজার বৎসরের গ্রামীণ লোক জীবনের পরিবেশ সৃষ্টির বাস্তব রূপায়ন ঘটিয়েছে।

(৬) লোকমেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ উপলক্ষ্যে কারু প্রদর্শনীর মঞ্চ স্থাপন করে দেশের আটাশটি জেলার প্রায় নব্বইটি দৈ এর হাঁড়ি প্রদর্শন করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় দৈয়ের হাঁড়ি সংগ্রহ করে তা প্রদর্শনের পরিকল্পনাও রয়েছে এই ফাউন্ডেশনের। বৈচিত্র্যময় দৈএর হাঁড়ির এই ব্যতিক্রম প্রদর্শনী এ মেলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৭। এদেশের প্রকৃতি হচ্ছে কারুশিল্পের কাঁচামালের উৎস। কাজেই প্রাকৃতিক উপাদান ও উপকরণের সাথে কারুশিল্পের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রকৃতির এই সকল তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে শৈল্পিক সুষমায় তৈরী করা হয়েছে ফাউন্ডেশনের উদ্ভাবিত নতুন কারুময় ফ্রেম, এবং তাতে সন্নিবেশিত ছিল শিল্পাচার্যের অমর শিল্পকর্ম এবং নকশী কাঁথা। লোকজ উৎসবে এই প্রদর্শনীটি ছিল একটি অন্যতম আকর্ষণ, এবং জননন্দিত। প্রকৃতির তুচ্ছ উপকরণদিয়ে এত সুষমামন্ডিত করে কারুময় ফ্রেম তৈরী এর আগে কোথায়ও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

(৮) আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতি হচ্ছে লোকশিল্পের কাঁচামালের উৎস। এ দেশের আবহাওয়া এবং প্রকৃতি বাঁশ ও বেত উৎপাদন উপযোগী। ফলে বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরী হয়েছে নানা রকমের লোকশিল্প সামগ্রী। ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ উপলক্ষ্যে কারুমঞ্চে প্রদর্শিত দুটি বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরী বেড়া ছিল কারুশিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন। আর এই শিল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং এই শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করাই ছিল এ আয়োজনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৯) লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ উপলক্ষ্যে আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন। আলোকচিত্র প্রচার ও যোগাযোগের একটি মাধ্যম। এই প্রদর্শনীতে মোট ৬০টি আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এই প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে লোকজ খেলা ধুলার ঐতিহ্য, লোক সংগীত এবং লোকাচারের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ছিল এ মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১০) লোক মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ উপলক্ষ্যে গোটা ফাউন্ডেশন নানা বৈচিত্র্যময় সাজ সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। এই বৈচিত্র্যময় সাজ সজ্জার মাধ্যমে লোক মেলাকে উৎসবমুখী করাই ছিল এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(১১) লোকমেলার ধারাবাহিকতা রক্ষার মধ্যদিয়ে লোক শিল্পের বিস্তৃতি, প্রসার এবং রূপান্তরের ধারাকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করার পথ সুসংহত করাই এ মেলা আয়োজনের মূল বৈশিষ্ট্য।

উপসংহারে বলতে হয়, ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোকমেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর আয়োজন ছিল সার্থক ও সময়োপযোগী। এর ধারাবাহিকতা লোকসংস্কৃতি বিকাশের পথ প্রসারিত করে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। অনাগত ভবিষ্যতের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নীতিমালার আলোকে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের লোক শিল্প একটি সঠিক পথের নির্দেশনা পাবে।

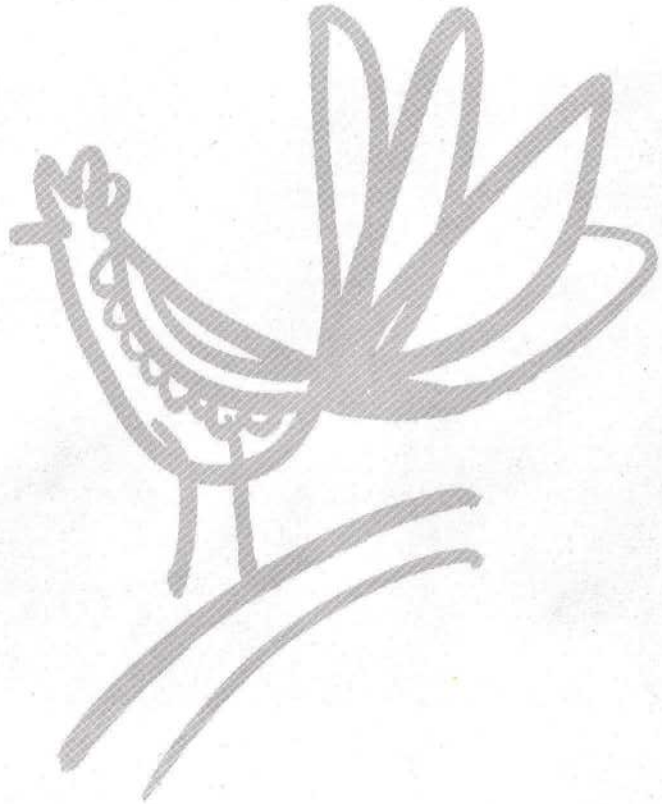

মেলার দর্শক সংস্কৃতি ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬

এ কে এম মুজ্জাম্মিলুল হক
গাইড লেকচারার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেলার প্রচলন আছে। তবে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী folk festival লোকজ উৎসব এবং folk fair বা লোকমেলার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য সৌন্দর্যবোধ আছে। এই সৌন্দর্য কখনো দৃশ্যগত, কখনো ধ্বনিগত আবার কখনো বা ভাবগত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'মিল' ধাতুর সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে মেলা শব্দের উদ্ভব হয়েছে। তাই বহু লোকের কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ কোন জায়গায় একত্রে সমাবেশ, সমাগম এবং মিলনকেই সাধারণত মেলা বলে অভিহিত করা হয়।

মেলা বাংলাদেশের আবহমানকালের ঐতিহ্য। মেলা বাঙালির লোক সংস্কৃতির বাহন হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির আবহমান অনাবিল আনন্দ ও আকর্ষণ মেলা। এদেশের নদী-নিস্বর্গ-মাটি-মানুষের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে মেলার আবাহন। বাঙালির জীবনে ঐতিহ্য ও অকৃত্রিম আশির্বাদরূপেই মেলার উৎসব আয়োজন। গ্রামীণ জীবনে মানুষের যে সকল বিনোদনের উপকরণ বিদ্যমান, মেলা তার মধ্যে অন্যতম। মানুষের জন্যই মেলার আয়োজন এবং প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি সুখের অনিন্দ্য সুন্দর উল্লাস, উচ্ছ্বাস মেলার মধ্যেই দেখা যায়। মেলা আমাদের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করছে।

আমাদের লোক সমাজের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সমন্বিত রূপই হলো-লোক সংস্কৃতি। তাই এই লোক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এদেশের লোককারুশিল্পে, লোক সাহিত্যে এবং লোক সংগীতের মাধ্যমে। অর্থাৎ আমাদের লোকজীবনের সাংস্কৃতিক পরিচয় লোক কারুশিল্পের ও লোক সংগীতের প্রচার, প্রসার, উৎকর্ষ, যোগাযোগ ইত্যাদির সমন্বয়ের ক্ষেত্রই লোক মেলা। আবহমান কাল থেকে অদ্যাবধি মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কোন উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে একত্রে মিলিত হয়ে আসছে। এ ভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্মিলিত হওয়ার রেওয়াজ রীতি থেকেই মেলার সূত্রপাত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই মেলা আগে এক সময় মানুষের সমস্ত পণ্যের চাহিদা মেটাতো। সুতরাং আমাদের আয়োজিত এ ধরণের মেলাকে শিক্ষামূলক মেলা বলা যায়।

প্রধান গেট থেকে মেলায় প্রবেশের পথ

মেলায় চড়কগাছ এবং দর্শনার্থীদের একাংশ

সে জন্য পরবর্তীকালে মেলা আমাদের দেশের লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে রূপলাভ করেছে। অবশ্য সংস্কৃতি কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। বিষয়টি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি দিককেই নির্দেশকরে। এটিকে মানুষের বিশ্বাস, বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভাবধারা, শিল্পকলা, ভাষা-সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য অভ্যাস প্রভৃতির এক জটিল ও সমন্বিত রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। যা মানব জীবনে নতুন সুর সংযোজন করে, মানসিক বৃত্তি বিকশিত করে এবং মানব জীবনে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়।

আবহমান কাল ধরে বাংলার লোক সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ধর্ম –বিশ্বাস, লোকিক আচার-আচরণ এবং উৎসবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আমাদের লোক সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যবাহী লোক মেলা। তবে লোক প্রচলিত মেলার সাথে আরো অনেক বিষয় জড়িত আছে। আর একটা মেলাকে সফল করার সবচেয়ে বড় বিষয় হলো দর্শক বা লোক সমাবেশ। এ প্রেক্ষিতে '৯৬ সালে আয়োজিত লোক মেলাতে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন চিন্তাধারার এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রচুর দর্শক সমাবেশ হয়েছে। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মেলাতে একাধিক রকমের হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, চারু ও কারুশিল্পের প্রসার এবং উৎকর্ষের পাশাপাশি বিচিত্র ধরণের মানুষের চিত্তবিনোদনমূলক উৎসব, প্রচুর দর্শক, বস্তুর সমাবেশ বা বস্তু সংস্কৃতি প্রদর্শনী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়, আমোদ প্রমোদমূলক মেলামেশা, লোকজ উৎসব, গানের আসর, কুস্তি খেলা, সহস্র বছরের গ্রামীণ খেলাধূলা, নৃত্যসংগীতানুষ্ঠান, যাত্রা, সার্কাস, ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গিতে সংদের প্রদর্শনী, লোকজীবনের চিরায়ত জীবন্ত প্রদর্শনী এবং হৈ-হুল্লোর এই সবের সমন্বিত আয়োজনই হলো লোক মেলা। এক্ষেত্রে অসংখ্য দর্শক, একটা সুন্দর পরিবেশ এবং বস্তুর সমাবেশ নিয়েই গঠিত হয় মেলা। সেখানে দর্শক এবং বস্তুর মিলনটাই বেশী হয়। এ অর্থে মেলা একটা মিলন কেন্দ্র।

ভিন্ন রুচির প্রচুর দর্শক এবং একাধিক বস্তুর সমাবেশ ঘটে লোক মেলাতে। সেখানে যেমন প্রচুর বস্তু আসে তেমনি বিভিন্ন রুচির দর্শকও আসে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যবোধের আকর্ষণ এই দুটো জিনিস নিয়েই হয় মেলার মিলন, মেলার সম্মেলন বা মেলার সমাবেশ। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন চিন্তাধারার এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য দর্শক সেখানে একত্রিত হয়। এছাড়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় করার জন্য বা বস্তু সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্যও দর্শকগণ একত্রিত হন কোন মেলাতে। সেখানে আগত দর্শকদের মনোভাব থাকে, যে জায়গাটায় তারা যাবেন তার (Environment) পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশটা সুন্দর হতে হবে।

এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশগত দিক ছিল অত্যন্ত মনোরম এবং শান্তিপূর্ণ। নানা প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে এ বছরের মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবকে সার্থক রূপায়নের প্রচেষ্টায় এই মেলা একটা সফল মেলা ভিত্তিক পরিবেশে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায়। আর বিগত বছরগুলোর মেলা ছিল উৎসব ভিত্তিক। কিন্তু গত বছর এবং চলতি বছরের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে এতে ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ গত বছর এবং এ বছরের আয়োজিত মাসব্যাপী মেলা ছিল শিক্ষামূলক বা গবেষণামূলক। '৯৫ এর পূর্বের মেলায় সমাগত দর্শকদের দৃষ্টি ছিল উৎসবের প্রতি। আমাদের আয়োজিত এ ধরণের লোকজ উৎসব মেলার একটা আকর্ষণীয় দিক হলেও এটাকে শিক্ষামূলক বা গবেষণার দিকে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে। আর প্রাচীনকাল থেকেই উৎসবের প্রতিও মানুষের একটা ভিন্ন ধরণের আকর্ষণ রয়েছে। সে আকর্ষণকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে ফাউন্ডেশন যত্নসহকারে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

তাছাড়া লোক মেলাতে লোকজ উৎসবের পাশাপাশি সমাগত দর্শকদেরকে মেলার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ফাউন্ডেশন গত বছর থেকে সুন্দর সুন্দর শৈল্পিক স্থাপনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিয়েছে, কারণ উৎসবের মত প্রদর্শনীর প্রতিও মানুষের একটা বিশেষ আর্কষণ আছে। গত বছর এবং চলতি বছরের মাসব্যাপী লোক কারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবে বিভিন্ন আকর্ষণীয় বাংলার চিরায়ত জীবন্ত প্রদর্শনী প্লাটফরম, নদী মাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকারের নৌকার মডেল প্রদর্শনী, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈয়ের হাঁড়ির, সখের হাঁড়ির প্রদর্শনী, আলোক চিত্র প্রদর্শনী এবং অতি সাধারণ উপকরণ শীতল পাটি, মাদুর, ধান, শামুক-ঝিনুক, পরিত্যাক্ত কাঠের ছোবড়া, শোলা, কাঁচভাঙ্গা, চিনা মাটির বাসন কোসন ভাঙ্গা টুকরা, মৃৎ পাত্রের ভাঙা টুকরা, নারিকেলের ছোবড়া, বড়ইবিচি, পাটশোলা, তেঁতুল বিচি, ভাঙ্গাচুড়ি, কাঁচ, র‍্যাদা দিয়ে চাঁছা কাঠের পাতলা কুন্ডলী পাকানো আঁশ ইত্যাদি প্রায় একশতটি উপকরণ দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় শৈল্পিক কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোককারুশিল্প মেলাও লোকজ উৎসব '৯৬ এর উল্লিখিত একাধিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং এর বিষয়বস্তু স্মরণকালের এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ যা পুরো মেলাচত্তরে এবং মাসব্যাপী উৎসবের আয়োজনে এনেছিল এক চলমান বর্ণাঢ্য পরিবেশ ও অনাবিল আনন্দের ধারা। এই সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রদর্শনীগুলো সমাগত দর্শকদেরকে বাংলার ঐতিহ্যের চিরায়ত পরিবেশ এবং হারিয়ে যাওয়া লোক শিল্পের সংগে পরিচয়ের এক দূর্লভ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উক্ত প্রদর্শনীগুলো আমাদের লোকজীবনের সকল আকাংখার প্রতিফলন এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে এই প্রদর্শন এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাহলে মেলার দর্শক সংস্কৃতি হলো যে, কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ মেলায় যায় এবং বিভিন্নভাবে আনন্দ উপভোগ করার জন্য জ্ঞান নেয়ার জন্য বা গবেষণা করার জন্যও মেলায় যায়। বিভিন্ন চিন্তা চেতনায়, ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন পণ্য বা জিনিসের প্রতি আকর্ষণে এবং সৌন্দর্যবোধ অবলোকন করার জন্য মানুষ মেলায় যায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার মানুষের সমাবেশ দেখার জন্যও অনেক দর্শক মেলায় গমন করে। শুধুই সমাবেশ নয় অনেকে আবার তাতে আনন্দ করার জন্য এবং জ্ঞান নেয়ার বা গবেষণা করার জন্যও যায়।

সে হিসেবে ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী মেলায় বস্তুসংস্কৃতি তথা সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আগত দর্শকদেরকে জ্ঞান অন্বেষণের সহায়ক সেমিনার সংস্কৃতির দিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিরোনামে তার অতীত, বর্তমান এবং রূপান্তরের ধারা শীর্ষক গবেষণামূলক কিছু সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এ ধরণের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব বা গবেষণামূলক সেমিনার বাংলাদেশে এটাই প্রথম এবং একটা ভিন্নধর্মী আয়োজন। সুতরাং বস্তু সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে দর্শক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আয়োজিত মেলায় লোক কারুশিল্পের প্রদর্শন, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন এবং এর স্থায়ী দলিলীকরণের লক্ষ্যে বাংলার শ্বাশ্বত লোকজ পরিবেশের সংগে সংগতি রেখে বর্ণাঢ্য সাজ সজ্জায় ফাউন্ডেশন প্রতি বছর এক উৎসব মুখর মেলার আয়োজন করে।

মূলতঃ আমাদের এ ধরণের মাসব্যাপী আয়োজিত মেলা হলো একটা শিক্ষামূলক বা গবেষণাধর্মী মেলা। এটাকে সফল করতে হলে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

মেলায় বস্তু সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন শৈল্পিক স্থাপনা প্রদর্শনীর সাথে আগত দর্শক-দেরকে অন্যান্য আকর্ষণীয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট করে মেলায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধির প্রতি যত্নসহকারে চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে আমাদের লোক জীবনে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান, চলার পথে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব, মেলা এবং সামাজিক উন্নয়নকে গভীর ভাবে অবলোকন করার একটা আনুষ্ঠানিক আয়োজন হলো লোক মেলা।

মেলাতে আবার কিছু কিছু দর্শক আসেন শুধুই কেনাকাটার জন্য বা বাণিজ্যিক কারণের জন্য। এরা মেলা দেখে বিভিন্ন উৎসব মূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশার জন্য এবং বাড়ীর প্রয়োজনীয় ও সৌখীন জিনিসপত্র কেনা কাটার জন্য। ফাউন্ডেশনের কারুপল্লীতে স্থায়ী ২০ (কুড়িটি) ষ্টল রয়েছে। এখানে কারুশিল্পীরা সরাসরি কারুপণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিক্রয় করে থাকে। কারুপল্লীর ষ্টলগুলোতে উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ী তৈরীর ওর্য়াকসপ, পাটজাত পণ্য, মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত, নক্শী কাঁথা, নকশী হাত পাখা ইত্যাদি। মেলায় আগত হাজার হাজার দর্শক এসমস্ত ষ্টল থেকে আকর্ষণীয় পণ্যদ্রব্য-ক্রয় করে থাকেন। ফাউন্ডেশনের শিল্পগ্রাম কর্মসূচীর আওতায় যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা ভিন্নরুচির দর্শকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন দর্শকবৃন্দ

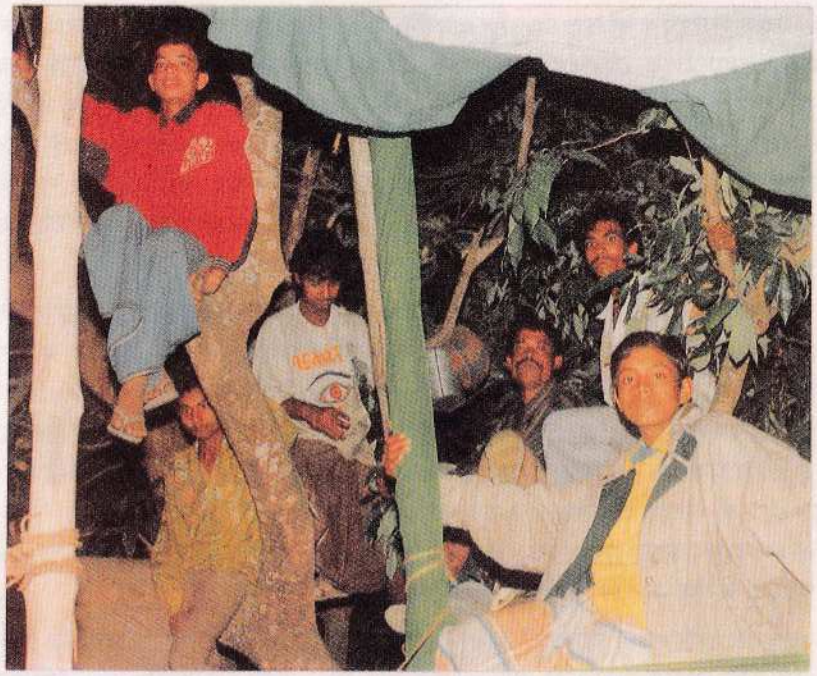

গাছে চড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছে কিছু দর্শক

সুতরাং একটা মেলায় বহু মুখী উপযোগিতার মধ্যে বাণিজ্যিক পণ্যের প্রদর্শনীতে ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি এর বিচিত্র উৎসব এবং আমোদ-প্রমোদের সাথে সাথে তার সাংস্কৃতিক দিকও বর্ধিত হয়। এহেন সাংস্কৃতিক দিকের সাথে মেলাতে দর্শক সংস্কৃতি ও বস্তু সংস্কৃতিও বর্ধিত হয় সমভাবে। এসব কারণেই মেলাতে দর্শকদেরও বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস স্বাভাবিক ভাবে সনাক্ত করা যায়। তখন তাদের চিন্তার প্রবাহ, তাদের চিন্তার ধারা, তাদের আনন্দের ধারা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

মেলাতে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে কেউ যায় বস্তু সংগ্রহের জন্য, কেউ যায় উৎসব উপভোগ করার জন্য, কেউ কেউ যায় মানুষ দেখার জন্য, আবার কেউবা যায় একটা সাধারণ আনন্দ করার জন্য বা ঘোরা ফেরা করার জন্য। তবে মেলার দর্শক সংস্কৃতির প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটা সফল মেলা আয়োজনের জন্য নিম্ন লিখিত দর্শক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

(১) স্থানীয় দর্শক ঃ (ক) স্থানীয় গ্রামীণ দর্শক। (খ) স্থানীয় নাগরিক দর্শক।

(২) নাগরিক দর্শক ঃ (ক) নাগরিক মধ্যবিত্ত দর্শক। (খ) নাগরিক উচ্চবিত্ত দর্শক।

(৩) বিদেশী দর্শক।

(৪) ভবঘুরে দর্শক।

(৫) জ্ঞানী দর্শক/গবেষক দর্শক।

(৬) শিশু দর্শক।

এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ এর মাসব্যাপী আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলাও লোকজ উৎসবে সমাগত দর্শক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে কি ধরণের দর্শক এখানে এসেছে তা দেখা যেতে পারে। সে হিসেবে দেখা যায় মেলাতে স্থানীয় দর্শকের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন, নাগরিক দর্শক ২০ জন, বিদেশী দর্শকের সংখ্যা শতকরা ০১ জন, ভবঘুরে দর্শক ১৪ জন এবং জ্ঞানী বা গবেষক দর্শকের সংখ্যা শতকরা ০৫ জন মাত্র। এ ছাড়াও সর্বমোট দর্শকদের মধ্যে শিশু দর্শক আসে শতকরা ৩০ জন। যেহেতু ফাউন্ডেশন একটা মফস্বল অঞ্চলে তাই এখানে স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় দর্শক বেশী এসেছে। সমাগত স্থানীয় দর্শকদের মানসিক অভিব্যক্তি ছিল উৎসবমুখী। উৎসবের জন্যই তারা বেশী এসেছেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ একটা পণ্যদ্রব্য ক্রয় বা একটা লোকজ প্রোগ্রাম উপভোগ করার জন্যও এসেছেন। এ ক্ষেত্রে গভীরভাবে দেখা যায় যে, মেলার দর্শক সংস্কৃতি একটা ভিন্ন রকম চিন্তা, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বা ভিন্ন চাহিদার প্রেক্ষিতে আগত দর্শকদের সংস্কৃতিও ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। সে জন্য দর্শক সংস্কৃতি অনুযায়ী মেলায় বিভিন্ন আকর্ষণীয় উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে।

মূলতঃ স্থানীয় দর্শক যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এ ধরণের দর্শক মেলার জন্য অবশ্যই দরকার আছে। কিন্তু শুধু এই শ্রেণীর দর্শক দিয়েই সফলভাবে একটা মেলা আয়োজন সম্ভব নয়, বরং মেলাতে প্রচুর

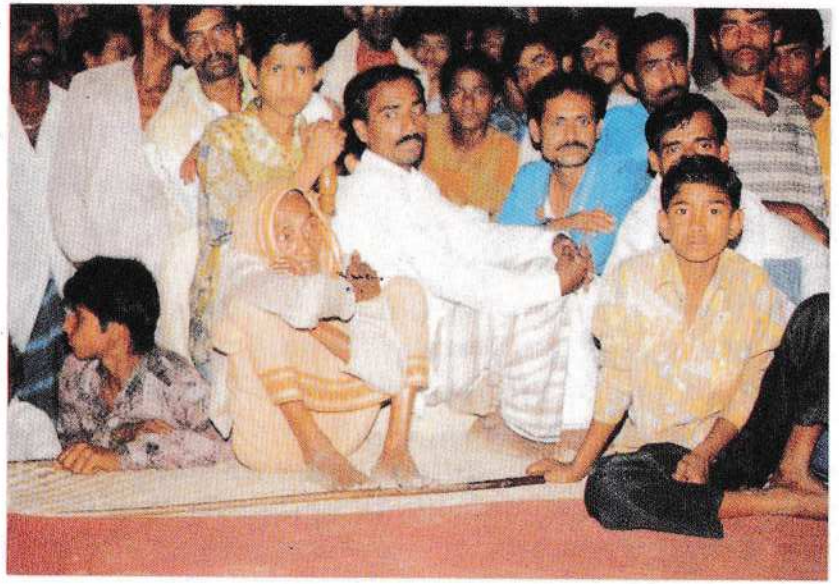

লোকজ অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন দর্শকগণ

নাগরিক দর্শক, বিদেশী দর্শক এবং জ্ঞানী গবেষক দর্শক সমাবেশের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এ সকল প্রয়োজনীয় উদ্যোগের মধ্যে বিশেষভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সম্ভব হলে এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ নিতে হবে।

মেলাতে স্থানীয় দর্শক ব্যতীত বাইরের যারা এসেছেন তাদের কাছে উৎসবটা প্রধান বিষয় ছিল না। তারা এসেছেন বস্তু সংগ্রহের জন্য এবং আকর্ষণীয় শৈল্পিক স্থাপনা বা অন্যান্য জিনিসপত্র প্রত্যক্ষ করার জন্য। ভবিষ্যতে মেলায় এ ধরণের দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং মেলায় সমাগত প্রতিটি দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য ভিন্নরুচির চাহিদার ব্যবস্থা রাখতে হবে। একটা সফল মেলা আয়োজনের জন্য উপরে উল্লেখিত সব ধরণের দর্শকদের আগমনের জন্য এর পরিবেশগত দিকের আরো ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে এবং বাঙালির লোকজীবনের প্রতিদিনের গ্রামীণ জীবন ধারার সাথে বা সর্বকোন থেকে দর্শন সাধ্যভাবে স্থাপিত লোক পরিবেশ সৃষ্টি করে অথবা পরিবেশের প্রয়োজনীয় ভাস্কর্য নির্মাণ করে দৃষ্টিতে চতুর্মাত্রিকতা এনে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রদর্শনের উদ্যোগ নিতে হবে। মেলাচলাকালীন সময়ে বেতার টি, ভি, সহ পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলেও এ বিষয়ে আরো ব্যাপক প্রচার বা এবিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। '৯৬ এর মাসব্যাপী লোক মেলাতে যে সমস্ত ষ্টল বসেছিল তাতে

তুলনামূলকভাবে কারুপণ্যের ষ্টলের সংখ্যা কম ছিল। আগামীতে দেশের ৬টি বিভাগ থেকে এবং সম্ভব হলে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থেকে আকর্ষণীয় কারুপণ্যের ষ্টল মেলায় বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে এবং আকর্ষণীয় কারুপণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আর প্রতি বৎসর মেলাতে প্রদর্শিত শৈল্পিক সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্য আনলে দর্শকদের যে একটা ভিন্ন সংস্কৃতি আছে আনন্দের সংস্কৃতি, জ্ঞানের, গবেষণার সংস্কৃতি, বাণিজ্যিক সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি মানুষের হৃদয় জয়ের সংস্কৃতি, তা সফল হবে। তাছাড়া আমাদের অকৃত্রিম সংস্কৃতিকে বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার জন্য মেলায় প্রচুর বিদেশী দর্শক সমাবেশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী দর্শকদের চোখ আর হৃদয় থাকে সাধারণত এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য জানার প্রতি। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের বস্তু বা উৎসব মেলাতে যদি বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়; তাহলেই কেবল বিদেশী দর্শকদেরকে মেলার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করবে। এক্ষেত্রে তাদের যাতায়াত ব্যবস্থায় যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করতে হবে। আমার মনে হয় দর্শকদের জন্য আমরা যদি যাতায়াত ব্যবস্থা আরো সুষ্ঠু ও সুগম করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে মেলায় বৈচিত্র্যময় দর্শকের অধিক আগমন ঘটবে।

লোকজ অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন দর্শকগণ

গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ শে মার্চ পর্যন্ত মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলাও লোকজ উৎসব '৯৬ এর প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এ বৎসর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, ভিন্ন চিন্তাধারা এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হাজার হাজার দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ মেলাতে হয়েছে। বিগত বছরগুলোথেকে এ বৎসর যেহেতু বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে বাংলার চিরায়ত আকর্ষণীয় শৈল্পিক নিদর্শনাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ফলে লোক মেলা সমৃদ্ধ হয়েছে। এবং মেলার দর্শক সংস্কৃতির প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভিন্নরুচির চাহিদাপূর্ণ সমাগত দর্শকশ্রেণী এতে তৃপ্তি পেয়েছে। আনন্দ উপভোগ করেছে এবং মেলা আয়োজন সফল হয়েছে। সুতরাং আমাদের লোক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনেই লোক মেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের বিপুল সমাবেশ ঘটাতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক বজলুর রহমান ভূঁইয়ার বক্তৃতা ও ওয়ার্কশপের ক্যাসেট-১।

(২) স্মরণিকা লোকজ উৎসব '৯৬। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

আর্ট এবং ফোকআর্ট সমন্বয় প্রসংগে ঃ প্রেক্ষিত লোকজ জীবন্ত প্রদর্শনী

মোঃ খলীলুর রহমান
নিবন্ধন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির আত্মপরিচয়। শুধু তাই নয় সংস্কৃতির মূল্য এতো অধিক যে তা শুধু মাত্র দেশের পরিচিতি ঘটানোর সহায়কই নয় বরং উন্নয়নের পথে ধাবিত করার এক অন্যতম চাবিকাঠি। যে জাতি যত উন্নত সে জাতি সংস্কৃতির দিক দিয়ে তত বেশী সমৃদ্ধশালী। আর সংস্কৃতি বিকাশের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আর্ট এবং ফোক আর্ট। আর্ট ও ফোক আর্ট এর উপরেই বিশেষ করে ফোক আর্টের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে লোকজ ঐতিহ্য, লোক সংস্কৃতি অর্থাৎ দেশের সংস্কৃতি।

নদীমাতৃক প্রকৃতি, ছায়া ঘন শস্য শ্যামল পরিবেশ, গ্রাম, লোক সমাজ, গ্রামের মানুষের সুখ দুঃখ সম্বলিত হাজারো লৌকিক আচার অনুষ্ঠান এবং আশা আকাঙ্খা নিয়ে আমাদের এ বাংলাদেশ। এই সব নিয়েই মানুষ আবহমান কাল থেকে ব্যক্তি মনের প্রকাশ হিসেবে আমাদের ঐতিহ্যগত লোকজ-চিত্র, লোকশিল্প ও প্রদর্শনী করে আনন্দিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। শুধু প্রাচীনই নয় স্বীয় বৈশিষ্ট্য, রীতি, বৈচিত্র্য ও অলংকরণে সমুজ্জ্বল। এ লোকায়ত শিল্প ধারায় লোক সমাজ ও সংস্কৃতির অপূর্ব আলেখ্য ফুটে রয়েছে। এ লোকশিল্প যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয় বরং ঐতিহ্য ভিত্তিক অশিক্ষিত অথচ দক্ষ গ্রামীণ শিল্পীর ব্যক্তিপ্রতিভার প্রকাশ মাত্র। এ সকল বংশানুক্রমেই সম্প্রসারিত। লোকাচার, লৌকিক বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, সহজলভ্য উপাদান ও উপকরণের সমন্বয়, প্রাচীন প্রথা, রীতিনীতি ও সংস্কার আমাদের লোক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। লোক ঐতিহ্যের পরিমন্ডল খুবই ব্যাপক। এই ঐতিহ্য লোকায়ত বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই শিল্পসম্ভার বাঙ্গালীর মন মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে।

হাজারো গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। বৈচিত্র্যময় গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শত সহস্র লৌকিক আচার এবং এর প্রবাহ।

শস্য শ্যামল ও সবুজ রং পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের পল্লীর জীবন প্রবাহ স্মরণ করিয়ে দেয় অতীত লোকাচারের। এই সকল লোকাচার আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সুখময় লোকজ জীবনের প্রবাহকে।

(১) লোকায়ত বাংলার জেলে, (২) কুম্ভকার, (৩) ছুতার, (৪) নাপিত, (৫) কর্মকার, (৬) তাঁতী, (৭) বেদে, (৮) সাপুড়ে, (৯) ফকিরালী, (১০) মোল্লাকী, (১১) গাইন, (১২) পটুয়া, (১৩) দৈওয়ালা, (১৪) ঘুড়ি বানানো, (১৫) গ্রামীণ মক্তব, (১৬) চুড়িওয়ালিনী, (১৭) কবিরাজ, (১৮) জ্যোতিষী, (১৯) বিয়ের ঘটক, (২০) গ্রামীণ বিচার, (২১) ঢেকিতে ধান বানা (২২) কাহাইলে ধান কাটা, (২৩) গায়ে হলুদ (২৪) গরুর গাড়ী, (২৫) ঘোড়ার গাড়ী, (২৬) বর যাত্রা, (২৭) বানর নাচ, (২৮) বায়স্কোপ, (২৯) লোক পিঠা তৈরী, (৩০) মোরগ লড়াই, (৩১) বাঁশী বাদক, ইত্যাদি আমাদের লোকজ ঐতিহ্য।

ঐতিহ্যগত জীবন প্রবাহ আলোচনায় আমাদের সামনে ভেসে উঠে উপরোক্ত চমৎকার লোকাচার গুলো।

(১) ***জেলে জীবন ঃ*** নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীর তীরে বসবাস করে জেলেরা, জাল দিয়ে মাছ ধরে মাছ বিক্রি করে, মাছ শুকায়ে শুটকি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে।

(২) ***কুম্ভকার জীবন ঃ*** মাটি দিয়ে ব্যবহারিক তৈজস পত্র যেমন হাঁড়িকুড়ি, কলসি, খেলনা ইত্যাদি তৈরী করে পরিবারের সকল সদস্য সম্মিলিত ভাবে।

জীবন্ত প্রদর্শনীতে খই ভাজার দৃশ্য

জীবন্ত প্রদর্শনীতে আলতা পড়ানোর সাথে নাচের দৃশ্য

জীবন্ত প্রদর্শনীতে বাঁশী বানানোর দৃশ্য

(৩) ***গ্রাম্য ছুতার জীবন ঃ*** প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ছুতার কাঠ দিয়ে তৈরী করে বিভিন্ন রকমের আসবাব পত্র, খেলনা ও ঘরবাড়ী ইত্যাদি।

(৪) গাঁয়ের নাপিত জীবন ঃ মওসুমী ফসল, নগদ অর্থের বিনিময়ে নাপিত ক্ষৌরী করে। লোক মানুষের চুল ও দাড়ি কাটে।

(৫) ***কর্মকার জীবন ঃ*** লোহা গরম করে লোহা দিয়ে কর্মকার তৈরী করে কাঁচি, দা. খন্তা, লাঙ্গলের ফাল, পাতাম, লোহা ও গজাল ইত্যাদি।

(৬) তাঁতী জীবন ঃ বধুরা চরকায় সূতা কাটে, সূতায় রং দেয়, আর তাঁতী তাঁতে তৈরী করে লোক মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গামছা, লুঙ্গি, শাড়ী, চাদর, মশারীর কাপড়।

(৭) গ্রাম্যবেদে ঃ বেদের দল সুন্দর বাড়ীঘর ফেলে ভেসে বেড়ায় গ্রামীণ নৌকায়। গাঁয়ে গাঁয়ে যেয়ে মেয়েরা বিক্রি করে চুড়ি, আয়না, চিরুনী, মালা ও বিভিন্ন প্রসাধন ইত্যাদি। আর পুরুষেরা নৌকায় কাজে ব্যস্ত থাকে।

(৮) গ্রাম্য সাপুড়ে ঃ ঝাপি ভরে সাপ নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে সাপের খেলা দেখায়।

(৯) গাইন ঃ গাইন গ্রামে গ্রামে ধর্মভীরু লোকসমাজে গাজীর কিচ্ছা বলে অর্থ আয় করে। সাধারণ লোক সমাজ একনিষ্ঠ চিত্তে শোনে লোককাহিনী ভিত্তিক পট।

(১০) বায়স্কোপ ঃ হাতে ডুগডুগি নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বায়স্কোপ প্রদর্শনকরে। গ্রামীণ লোক মানুষ বায়স্কোপে চমৎকার দৃশ্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনা দেখতে পায় কিছু পয়সার বিনিময়ে।

(১১) ফকিরালী ঃ ফকির সাহেব ঝার ফুক দিয়ে তাবিজ, লাউয়ের বিচি, হর্তুকী, আমলকী ও বয়রা ইত্যাদি লোক ঔষধ হিসেবে বিক্রি করে।

(১২) ***মোল্লাকী ঃ*** মুসলমানী, বিয়েশাদী, মৃত্যুর পর জানাজা ইত্যাদি কাজে মোল্লা সাহেবদের কদর হয়।

(১৩) নৌকা বাইচ ঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রায় অঞ্চলেই নৌকা বাইচ খেলা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন উৎসব ও পর্বের সময়।

(১৪) গায়ে হলুদ ঃ বিয়ের গান বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের জনপ্রিয় গান। বর/কনেকে বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদ দিয়ে যে গান বা গীত হয় সেটাই হচ্ছে হলুদের গান। সাধারণত মেয়েরাই এ গান পরিবেশন করে থাকে।

এ ছাড়া পাল্কীতে বর যাত্রা, পাল্কীতে বর কনে ও হাক রাইত অনুষ্ঠান ইত্যাদি ছিল গ্রাম বাংলায় বৈচিত্র্যময় হাজারো লোক ঐতিহ্যের অন্যতম।

আবহমান বাংলার হাজারো লৌকিক আচার এবং ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে। প্রাচীন কাল থেকে এ পর্যন্ত বহুচিত্র, চারু, কারু ও ঐতিহ্যবাহী লোক শিল্প ও লৌকিক আচার হারিয়ে গিয়েছে শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে, জীবন ধারণের প্রক্রিয়া রূপান্তরিত হয়ে শহর জীবনে পরিণত হয়েছে। আমরা হারিয়ে যেতে বসেছি আমাদের অতীত ঐতিহ্য, অথচ এই লৌকিক আচার, ঐতিহ্যগত চারু, কারু ও লোকশিল্প স্বাজত্যবোধের জন্য, স্বাজত্য বোধের দর্শনের জন্য, জাতিতাত্ত্বিক দর্শনের জন্য সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতি বছর লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবে জীবন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।

১৯৯১-৯২ সালে ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোকজ উৎসবে প্রদর্শনী হয়েছে যথাক্রমে সাপের খেলা, ঘুড়ি উড়ানো এবং মোরগ লড়াই।

১৯৯২-৯৩ সালে লোক জীবন ভিত্তিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

ক) গায়ে হলুদ
খ) পাল্কীতে বর কনের যাত্রা
গ) সাপের খেলা
ঘ) মোরগ লড়াই
ঙ) বানর নাচ
চ) লোক পিঠা তৈরী

১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ বৎসরের তুলনায় অধিকতর মনোরম ভাবে লোকজ জীবন ভিত্তিক প্রদর্শনী শুরু হয় ১৯৯৩-৯৪ সন থেকে। ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক মেলা ১৯৯৩-৯৪ সনে জীবন্ত প্রদর্শনী প্রদর্শিত হয় নিম্নরূপ ঃ

ক) গায়ে হলুদ
খ) লোক পিঠা তৈরী
গ) বরকনের প্রথম যাত্রা
ঘ) পাল্কীতে বর যাত্রী
ঙ) ঘোড়ার গাড়ী
চ) ঘুড়ি উড়ানো

জীবন্ত প্রদর্শনীতে গ্রামীণ বিচারের একটি দৃশ্য

জীবন্ত প্রদর্শনীতে বিয়ে পড়ানোর দৃশ্য

ছ) সাপের খেলা

জ) মোরগ লড়াই

ঝ) বানর নাচ

ঞ) নৌকায় ভাটিয়ালী সুরে বাঁশী বাজানো।

১৯৯৪-৯৫ বছরে ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আর্ট ও ফোক আর্টের সমন্বয়ে অধিকতর আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে প্লাটফরম গঠন করে জীবন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মাটির আয়তকার প্লাটফরমের একদিকে আর্ট ও ফোক আর্টের সমন্বয়ে চিত্রাংকন করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে-

ক) ***দৈওয়ালা ঃ*** পড়নে ধূতি, গায়ে হাতাওয়ালা গেঞ্জি ও কোমরে গামছা পরিহিত দৈওয়ালার সামনে রয়েছে দুধের হাড়ির ভিতর বাঁশের লাঠির খাচ কাটা অংশ। লাঠির বহিরাংশের সঙ্গে প্যাচানো দড়ি হাতে টেনে দৈওয়ালার মাঠা তৈরীর বাস্তব অভিনয় সকল দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে।

খ) ***গ্রামীণ মক্তব ঃ*** ধর্মীয় পাঠশালার পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে। অংকন করা হয়েছে লম্বা কুর্তা ও লোকটুপি পরিহিত মৌলভী সাহেব, তাকে ঘিরে রয়েছে অগণিত মক্তব ছাত্র-ছাত্রী, বাস্তব অভিনয় অতি চমৎকার।

গ) ***গায়ে হলুদ ঃ*** গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের আঙ্গিনা চিত্রাংকন করা হয়েছে। কনেকে হলুদ মেহেদী দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে কনের বান্ধবী সকল। এ প্রদর্শনীতে স্কুলের ছাত্রীগণ বাস্তব অভিনয় করে মন আকৃষ্ট করেছে হাজারো দর্শকের।

ঘ) ***ঘুড়ি বানানো ঃ*** এই প্লাটফরমের চিত্রাংকনে রয়েছে রং বেরং এর রঙ্গিন ও সাদা পাতলা কাগজ এবং বাঁশের চিকন কাইম দিয়ে ঘুড়ি বানানো এবং নাটাই হাতে ঘুড়ি উড়ানোর দৃশ্য। বাস্তব ভাবে বিভিন্ন গড়ন, গঠন, ডিজাইন ও রঙের ঘুড়ি তৈরীর পদ্ধতি সকলের মনকে আকৃষ্ট করেছে।

ঙ) ***চুড়ি পড়ানো ও বিক্রি ঃ*** চুড়ি পড়ানো ও বিক্রি প্লাটফরমের চিত্রাংকনে রয়েছে কোমর বিছা পরিহিতা বেদেনী, ঝাপি ভর্তি চুড়ি ও গ্রামীণ মেয়েদের চুড়ি পড়ানোর দৃশ্য।

বাস্তব অভিনয়ে বেদেনীর বেশে স্থানীয় স্কুল ছাত্রীদের চুড়ি বিক্রয় ও চুড়ি পড়ানোর দৃশ্য শ্যামল বাংলার গ্রামীণ চুড়ি ওয়ালিনীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

চ) ***গ্রামীণ বিচার ঃ*** গ্রামীণ বিচার প্লাট ফরমের চিত্রাংকনে রয়েছে গ্রামীণ বিচারক, আসামী ও ফরিয়াদী। বাস্তব অভিনয় প্রদর্শনে ক্রীড়ামোদী ছাত্রদের ভূমিকা সকলের প্রশংসার দাবীদার।

ছ) ***গ্রাম্য কবিরাজ ঃ*** গ্রামীণ কবিরাজের দাওয়া তৈরীর চিত্রাংকনে রয়েছে হাম্বল দিস্তা। বাস্তব অভিনয়ে কবিরাজের দাওয়া বানানোর প্রদর্শনী ছিল অতি চমৎকার।

জ) ***জ্যোতিষী ঃ*** সময়কাল, ভাগ্য, সুখ-দুঃখ, পাত্রপাত্রীর মিলন ইত্যাদি নির্ণয়ে জ্যোতিষী প্লাটফরমের চিত্রাংকনে শিল্পী সুনিপুনভাবে অংকন করেছে জ্যোতিষীর ছবি। বাস্তব অভিনয় প্রদর্শনে জ্যোতিষের হাতে গাড়ু ও দেখা গিয়েছে।

ঝ) ***বিয়ের ঘটক ঃ*** বিবাহ বন্ধনে ঘটকের ভূমিকা গ্রাম বাংলার অন্যতম লৌকিক আচার। এই প্লাট ফরমের চিত্রে চিত্র শিল্পী বিয়ের ঘটককে মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গি, বোগলে ছাতা সম্বলিত অবস্থায় দেখিয়েছে। বাস্তব অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঘটকের লৌকিক আচরণ।

ঞ) ***ঢেকিতে ধান বানা ঃ*** ঢেকি পল্লী বাংলার কৃষকদের ধান বানার অন্যতম লোকজ মাধ্যম। ঢেকিতে ধান বানা প্লাটফরমে দেখানো হয়েছে ঢেকি, ঢেকিতে ধান কাটায় ২ জন মহিলা, ১ জন চাল ঝাড়ছে। বাস্তব অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে শস্য শ্যামল বাংলার কৃষক পরিবারের সজীব চিত্র।

আমরা যদি ফোক আর্ট বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের দেশে ফোক আর্টের তিনটি ধারা দেখতে পাই।।

(১) প্রথম ঃ অতীতে আমাদের লোকশিল্প কি ছিল? সেটা দেখাবার প্রয়াস নেই।

(২) দ্বিতীয় ঃ অতীত ও বর্তমান ধারা মিলিয়ে আরেকটি ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) তৃতীয় ধারা হলো নতুন ফোক আর্ট সৃষ্টি।

আমাদের হারিয়ে যাওয়া লোক ঐতিহ্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে আর্ট ও ফোক আর্টের সমন্বয়ে নতুন প্রক্রিয়া ও ধারায় যাতে ঐতিহ্যকে বিস্তার করা যায় সে লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন জীবন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিয়েছে। এটা একটি সম্পূর্ন নতুন উদ্যোগ, একটি নতুন আবিস্কার। বাংলাদেশের মেলাতে এধরণের প্রদর্শনী সাধারণত চোখে পড়ে না। ফাউন্ডেশন গত বছর থেকে এ জীবন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহন করেছে এবং এটা আর্ট ও ফোক আর্ট বিস্তারের জন্য, হারিয়ে যাওয়া লোকাচার মানুষের হৃদয় পটে স্থায়ী ভাবে গেঁথে দেয়ার লক্ষ্যে, হারিয়ে যাওয়া লোক ঐতিহ্যকে মানুষের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য, স্বাজাত্য বোধের দর্শনকে দর্শনের ভিত্তিতে শক্তিশালী করার জন্য এই প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এর সময় গত দুই বছর ধরে দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় লোকাচার সমূহ অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শনের চেষ্টা করে আসছে।

লোকাচার চিরায়ত শিল্প। এ শিল্প বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। এতে মিশে আছে লোক মানুষের কথা, প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের সুখ–দুঃখ, আশা নিরাশা ও প্রেম ভালবাসা। বাংলাদেশের প্রাচীন লোক জীবনের সাংস্কৃতিক রূপ বৈচিত্র্যের সৃজনশীল বিকাশ ঘটেছে ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ৯৬ এর জীবন্ত প্রদর্শনীতে।

১৯৯৬ এর প্রদর্শনীতে রয়েছে ঃ

(১) বিয়ে পড়ানো, (২) গ্রামীণ বিচার, (৩) রাখালের বাঁশী বাজানো, (৪) মুড়ি ও খৈ ভাজা এবং (৫) আলতা পড়ানো।

এ সকল পরিবেশ আমাদের সকলেরই চেনা, জানা এবং অতিপরিচিত। তা সত্ত্বেও সামাজিক বিবর্তনের কারণে আমরা এ সকল ভুলে যাচ্ছি। অথচ এ সকল আচার অনুষ্ঠান আমাদের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে যাতে আমরা না ভুলি, যাতে আগামী প্রজন্ম এ গুলো দেখে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে সে জন্য এ সকল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

বিয়ে পড়ানো ঃ বিয়ে পড়ানোর দৃশ্য বাংলাদেশের গ্রামীণ লোক সমাজের একটি অতি পরিচিত লৌকিক আচার। এই আচারকে একটি আয়তাকার মাটির মেঝের পেছনে খন্ড চিত্রের রঙ্গীন পেইন্টিংয়ে দেখানো হয়েছে। মাটির মেঝটির ৩ দিকে বাঁশের চিকন কাইম দিয়ে ব্রাকেট সৃষ্টি করা হয়েছে। পেইন্টিংয়ে শিল্পী এক দিকে কনে, অন্যদিকে বর এবং বর কনের পক্ষের লোক মানুষ অংকন করেছে। বরের মাথায় পাগড়ি, হাতে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকা, কনেকে ঘিরে আছে তার বান্ধবী সকল, লোকটুপি মাথায় দিয়ে বিয়ের কাজী সাহেব, কাবিনের বই ইত্যাদি এ যেন বাংলার এক অপূর্ব দৃশ্য। পেইন্টিংয়ের সামনে চিত্র মোতাবেক বিয়ে পড়ানোর অবিকল অভিনয়ে রয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ক্রীড়ামোদী ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ।

জীবন্ত প্রদর্শনীতে আলতা পড়ানোর দৃশ্য

গ্রামীণ বিচার ঃ লোক সমাজ নিয়ে গ্রামীণ পরিবেশ। এ পরিবেশে যেমনি সুখ রয়েছে, তেমনি রয়েছে আনন্দ, কিছু দুঃখ ও সংঘাত, আর সংঘাত এড়ানোর জন্য লোক মানুষের সমাজে গ্রামীণ বিচার আচারের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীণ বিচারের পেইন্টিংয়ে শিল্পী অংকন করেছে চেয়ারে উপবিষ্ট লোক টুপি, পাঞ্জাবী ও লুঙ্গি পরিহিত কাজী। তার বাম ও ডান দিকে রয়েছে বাদী ও বিবাদী পক্ষ।

চিত্র মোতাবেক গ্রামীণ বিচারের অবিকল অভিনয় প্রদর্শন করেছে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ।

বাঁশী বাজানো ঃ লোক সংগীত আমাদের চিরায়ত শিল্প। এ সংগীত পরিবেশনের অন্যতম যন্ত্র হচ্ছে বাঁশী।

ফুৎকার যন্ত্র হচ্ছে বাঁশী। লোকসংগীত যন্ত্র হিসেবে বাঁশী আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আধুনিক যন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে ফুৎকার যন্ত্র বাঁশী আজ ততটা দেখা যায় না। অথচ এক সময়ে গ্রাম বাংলার বাঁশীর সুরে লোকমানুষের অন্তর ঝংকৃত হয়ে উঠতো। বাঁশী বানানো ও বাঁশী বাজানোর দৃশ্য ও বাস্তব অভিনয় মেলায় আগত হাজারো দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে।

বাঁশী প্লাট ফরমের পেইনটিংয়ে অংকন করা হয়েছে এক কোনে ছোট বাঁশ ঝাড়, ওখান থেকে বাঁশ কেটে শিল্পী বাঁশী বানাচ্ছে। এ চিত্রের সাথে মিল রেখে বাস্তব অভিনয় প্রদর্শন করেছে সংগীত প্রিয় ছাত্ররা। মাথায় গামছা, গায়ে নিমা, পড়নে লুঙ্গি, কোমরে গামছা বেধে বাঁশী বাজানোর দৃশ্য বাংলার সহজ সরল লোক মানুষের এক অপূর্ব দৃশ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলতা পড়ানো ঃ গ্রাম বাংলার মেয়েদের অলংকরণে আলতা একটি আকর্ষণীয় উপাদান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিয়ে ও ঈদের সময় মেয়েরা আলতা ব্যবহার করে থাকে।

আলতা পড়ানোর দৃশ্যে রয়েছে তিনটি যুবতী মেয়ের ছবি। দুজন বান্ধবী সম্মিলিত ভাবে তাদের অন্য বান্ধবীকে আলতা পড়িয়ে দিচ্ছে। এ দৃশ্যের সাথে মিল রেখে স্থানীয় স্কুলের সংস্কৃতিমনা ছাত্রীগণ আলতা পড়ানোর বাস্তব অভিনয় প্রদর্শন করেছে।

তাদের অভিনয় কালে রূপান্তরিত ধারার আরেকটি মনোরম দৃশ্য চোখে পড়েছে, তা হলো লোকনাচ এবং লোকসংগীত পরিবেশনা। নাচ ও সংগীত আলতা পড়ানোর দৃশ্যে অতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে।

মুড়ি ও খৈ ভাজা ঃ মুড়ি ও খৈ গ্রাম বাংলার লোক খাদ্য। বাংলার ঘরে ঘরে এক সময়ে এই খৈ ও মুড়ি ভাজা হতো। সব ঋতুতে খৈ ও মুড়ি খাওয়ার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে নববিবাহিতা বধু তার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময়ে শখের হাড়িতে করে খৈ ও

মুড়ি নেয়ার প্রচলন আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু আজ গ্রাম বাংলার এ লোকাচারের বিলুপ্তি ঘটছে। এই বিলুপ্ত লোক শিল্পকে ধরে রাখার মানসেই খই ও মুড়ি ভাজার প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটির প্লাট ফরম আয়তাকার মাটির মেঝের তিন দিকে বাঁশের কাইম দ্বারা শোভনীয় করা হয়েছে।

এ চিত্রে মুড়ি ও খৈ ভাজার উপাদান দুটি চুল্লিতে দুটি মেয়ে যথাক্রমে ঝাঝর ছামণিতে মুড়ি ও খৈ ভাজছে। খৈ ও মুড়ি রাখার জন্য ২টি ঝুড়ি রয়েছে। এ চিত্রের সংগে মিল রেখে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রীগণ মুড়ি ও খৈ ভাজার যে অবিকল অভিনয় প্রদর্শন করেছে তা মেলায় আগত হাজারো দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে। আবহমান কাল থেকে পল্লী বাংলার এ সকল লৌকিক আচার, অনুষ্ঠান চারু ও কারুশিল্প বাংলাদেশে অতি সুপরিচিত ছিল। কালের পরিবর্তনে, আর্থিক দৈন্যতা ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে এ সকল আচার আমাদের সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আর্ট ও ফোক আর্টের সমন্বয়ে আমাদের বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য বিশ্ববাসীর সামনে পরিচয় করে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে ফাউন্ডেশনের এ সকল প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীর সময় ফাউন্ডেশন কতগুলো নিয়ম, পদ্ধতি ও ধারা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। মেলাকে ততই আকর্ষণীয় করা সম্ভব যত বেশী বস্তু সংস্কৃতির বিকাশ করানো যাবে, ব্যক্তিসংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো যাবে। মেলাতে যতবেশী বৈচিত্র্যময় প্রদর্শন আনা যাবে, মেলা তত বেশী বৈচিত্র্যময় হবে। মানুষের মনও তত বেশী আকৃষ্ট হবে। সে লক্ষ্যে আর্ট ও ফোক আর্ট মিলিয়ে একটি নতুন ধারায় প্লাট ফরম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফোক আর্টের এ নতুন ধারাটি ঐতিহ্য সন্ধানে এক নতুন দিক উন্মোচন করবে।

আর্ট ও ফোক আর্টের সমন্বয়ে ফাউন্ডেশন শুধু বস্তু সংস্কৃতি প্রদর্শন করে বস্তুর সংরক্ষণই করছে না, পৃথিবীর বহু দেশের মেলায় জীবন্ত প্রদর্শনীর ন্যায় এখানেও "লাইফ শো" প্রদর্শনীর প্রয়াস নিয়েছে যা এখানে আর্ট ও ফোক আর্টের এক সমন্বিত প্লাটফরম জীবন্ত প্রদর্শনী; যেটা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সর্বশেষ ধারার। ফাউন্ডেশন গত '৯৫ লোক মেলা থেকে বাস্তবভাবে, জীবন্তভাবে লোকাচার প্রদর্শনী আর্ট ও ফোক আর্টের সমন্বয়ে দেখাবার যে প্রয়াস নিয়েছে বাংলাদেশে এটাই ছিল প্রথম প্রদর্শন। নতুন ধারার এই ধরনের প্রদর্শনী ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবে।

এই জীবন্ত প্রদর্শনী লোক জীবনের সুকুমার বৃত্তির প্রতিফলন। বিশেষ করে আজকের প্রজন্মের কাছে এই জীবন্ত প্রদর্শনী এক নতুন অভিজ্ঞতা।

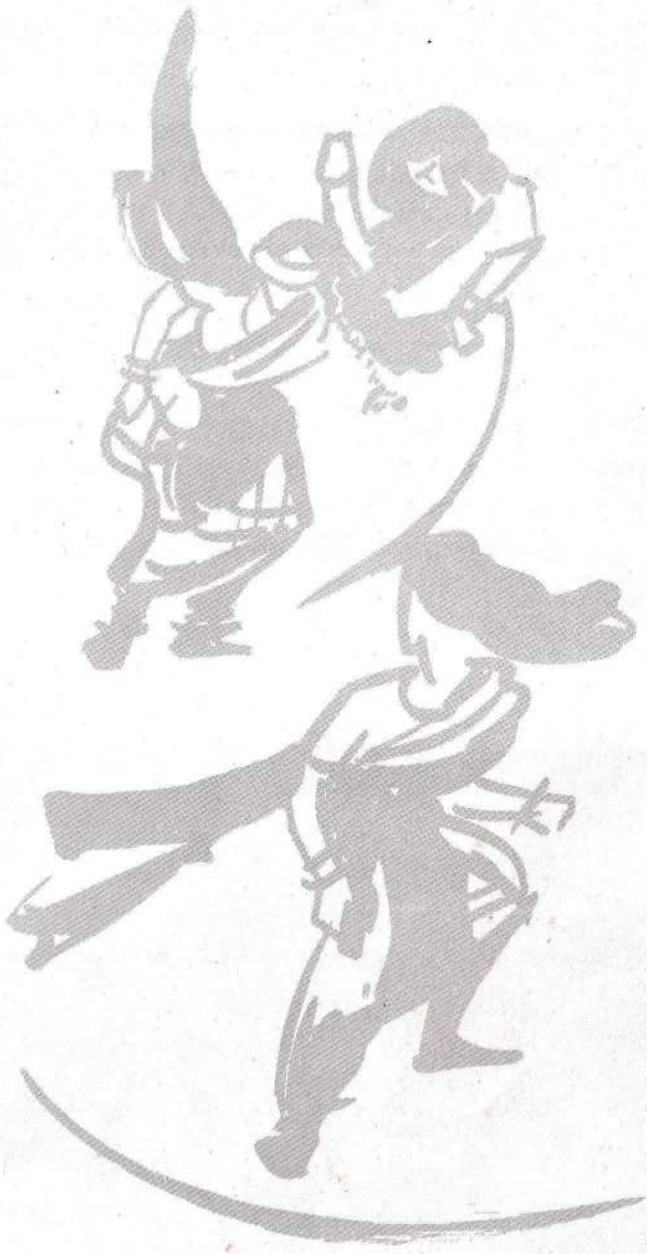

মেলার সেমিনার প্রসঙ্গ ঃ লোকজ সংস্কৃতির স্থায়ী বিস্তারে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

দিলরুবা বেগম
সহকারী লাইব্রেরীয়ান
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

মানুষের সৃষ্টিশক্তির পরিচয় তথা একটি জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। মানুষ সৃজনশীল বলেই সে অন্য জীব হতে স্বতন্ত্র। মানুষ আদি কাল থেকে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে প্রকৃতিকে জয় করেছে তার সৃষ্টির সহায়তায়। সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায় সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সমস্ত সৃষ্টি সম্পদ (arts) অর্থাৎ যা আমরা জেনেছি প্রকৃতির নিয়ম নীতি প্রভৃতি, যা আমরা করেছি যন্ত্র শিল্প, রীতি-নীতি,আচার অনুষ্ঠান, মানসিক প্রয়াশ চিন্তা ভাবনা, নৃত্য, গীত, চিত্র, কাব্য, প্রভৃতি। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলাকা আর শিল্প বলতে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আর মানস সৃষ্টি দুই-ই কারণ দুই-ই সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। আর লোকজ সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তাহলো গ্রাম্য লোক সমাজে পরম্পরগত আচার আচরণ এবং সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিক প্রয়াস সবই লোক সংস্কৃতি। একে গ্রামীণ সংস্কৃতিও বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশ একটি বৃহৎ গ্রাম। এ গ্রামের পরতে পরতে হাজারও লোকজ উপকরণ ছড়িয়ে আছে। হাজার বছরের বাংলার এবং বাঙালীর সংস্কৃতি হলো লোক সংস্কৃতি। এদেশের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠি তাদের বাঁচার তাগিদে তাদের সহজ সরল অভিব্যক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছে লোকশিল্প। এই সমস্ত নিরক্ষর মানুষের পদ্ধতিগত কোন জ্ঞান ছিলনা। ছিল না কোন প্রেরণা। নিজের মনের তাগিদে ক্লান্তি হরণের অবসর মুহূর্তে তারা গড়ে তুলতো একান্ত আত্মার শিল্প এই লোক শিল্প। এ দেশের নদীর ছলছল শব্দ, পাখীর কুহুতান, বাতাসের ঝিরি ঝিরি শব্দ, বাংলার এ উদাস করা বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে বাঙালীর সম্পর্ক এতই গভীর যে এই আবহাওয়ায় স্বভাবগত ভাবেই কেউ হয়েছে বাউল। কত শত জারী, সারী, ভাটিয়ালীর সৃষ্টি হয়েছে। কেউ হয়েছে কৃষক, কেউ কামার, কেউ কুমার, তাঁতী, জেলে একান্তই বাংলার মাটি থেকে গড়ে উঠেছে তাদের শিল্প, সাহিত্য। এই ভাবে গড়ে উঠেছে বাংলার গ্রামীণ জীবনের শিল্প সাহিত্য, কৃষ্টি, কালচার অর্থাৎ তাদের Way of life.

বিশ্বের সমস্ত জাতিরই, সমস্ত দেশেরই নৃতাত্ত্বিকগত ভাবে অর্থাৎ জন্ম লগ্ন থেকে উদ্ভূত একটি সংস্কৃতি থাকে। প্রথাগত বা জাতিতাত্ত্বিক নিজস্ব সংস্কৃতি প্রত্যেকটি দেশ ও জাতির নিকট একটি অহংকারের জিনিস। একান্ত আত্মার জিনিস। যে কোন দেশ ও জাতির লোক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেই দেশের সভ্যতা ও জাতীয় ঐতিহ্য। বাংলাদেশের সভ্যতাও গড়ে উঠেছে আবহমান কালের বাঙালী জাতির লোক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই। তাই এই লোক সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। কালের সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। কালের বিবর্তনের ফলে আমাদের দেশের হাজার বছরের লোক সংস্কৃতি অনেক হারিয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হারিয়ে যাবে। কারণ আধুনিক কালচারের চাপে লোক সংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সে জন্য আমাদের লোক সংস্কৃতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আমাদের দেশ ও জাতির উৎকর্ষতার জন্য এই লোক সংস্কৃতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর সংরক্ষণ ও বিস্তার ঘটানোর জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে যাতে এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখা যায় সে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে হবে। প্রথাগত সংস্কৃতির ধারাকে বজায় রাখতে হলে এর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনঃউৎপাদন ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সংরক্ষণ বিভিন্ন ভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। তারমধ্যে মেলা অন্যতম একটি মাধ্যম, কারণ মেলার মাধ্যমেই লোকজ শিল্পের ঐতিহ্যময় দ্রব্য সামগ্রীর সমাবেশের যে পরিপূর্ণতা লাভ করে তা আর অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব হয় না। কারণ মেলা আনন্দ উৎসব মুখরিত এমন একটি জায়গা যেখানে বিভিন্ন ভাবে সংরক্ষণ, সংগ্রহ, উৎপাদন প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের বিষয়গুলো পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

আমাদের ফাউন্ডেশনের মেলাতেও বাংলার আবহমান কালের মেলার মতই লোকজ দ্রব্য সামগ্রীর প্রদর্শন, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও পুণঃউৎপাদনের দ্রব্যাদির সমাবেশ ঘটে ছিল। সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের জন্য মানুষের মধ্যে এই সংস্কৃতিকে গেঁথে দেওয়ার জন্য, এর গুরুত্ব বোঝার জন্য, কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এদেশের একটি অন্যতম প্রধান মেলা। এত বাস্তবধর্মী, এত উৎসব মুখর মেলা এদেশে আর কোথাও আয়োজন করা হয় না। এই মেলায় সহস্র বছরের গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতি লোকজ জীবনের আচার অনুষ্ঠানকে জীবন্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। লোকজ খেলাগুলি যাতে হারিয়ে না যায় সে লক্ষ্যে খেলাগুলোকে গ্রামীণ ধারায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং লোকজ ধারায় লোকসঙ্গীতের গায়েনদের দিয়ে সকল ধরণের লোকসঙ্গীত উপস্থাপন করে এই মেলাকে করে তোলা হয় আরও আর্কষণীয় ও অর্থবহ। মেলাতে শুধু আনন্দ উৎসবই নয় এর গবেষণার দিকটি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনকে অনুধাবন করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন শুধু প্রদর্শনের জন্য এবং আনন্দ উৎসবের জন্য যে মেলার সমাবেশ করেছে তা নয়, এর একটা গবেষণার ক্ষেত্রও তৈরী করেছে। বাংলাদেশে এই প্রথম এই লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য গবেষণার প্রেক্ষাপটের সূচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের লৌকিক সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুশীলন করার কোন পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে নাই। আমাদের দেশে লোক সাহিত্যের কিছু সংগ্রহ আছে তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। লোক সাহিত্যের উপর যে সমস্ত সংগ্রহ হয়েছে তা সর্বদাই আঞ্চলিক যেমন ময়মনসিংহ গীতিকা, এই ধরণের এক

"জামদানীর অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

"নক্শী কাঁথার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডঃ ওয়াকিল আহমেদ

একটি অঞ্চলের উপর সংগ্রহ আছে। কিন্তু লোকসাহিত্য শুধু লোকসংস্কৃতির একমাত্র উপকরণ নয়, একটি অন্যতম উপকরণ মাত্র। লোক সংস্কৃতির পরিধি ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে একটি দেশ ও জাতির আচার-আচরণ, প্রথা, নিয়মনীতি কাব্য-গীতি প্রভৃতি হলো একটি দেশের বা জাতির দর্পণ যার মাধ্যমে একটি দেশ ও জাতি তার আলাদা সত্ত্বা নিয়ে ধরা দেয়।

তাই এই লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এর ধারাকে গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য থেকে সেমিনার সিম্পোজিয়ামকে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উত্তম প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সন থেকে ফাউন্ডেশন এই সেমিনারের আয়োজন করেছে। গত বছর লোক সঙ্গীতের অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারার উপর সেমিনার হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে সেমিনার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই আলোচনা করা দরকার সেমিনার কি? সেমিনার হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের গভীরে যেতে হলে দলবদ্ধ ভাবে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে যে সভা করা হয় সেটা হলো সেমিনার।

(১) কোন একটা বিষয়কে নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনার সাধারণত ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে হতে পারে। আবার যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দের মধ্যে হতে পারে। অথার্ৎ সেমিনার একধরণের প্রশিক্ষণ এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। কাজেই এটি যে কোন শিক্ষার্থীর জন্য হতে পারে, আবার কর্মক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনার জন্য কর্মীবৃন্দের জন্যও হতে পারে।

(২) সেই হিসাবে ফাউন্ডেশনে আয়োজিত এ সেমিনার মেলার একটি গবেষণামূলক দিক। লোকসংস্কৃতির স্থায়ী বিস্তারের জন্য এই ফাউন্ডেশনের মেলার সেমিনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক দলিলীকরণের জন্য এবং এর রূপান্তরের নৃতাত্ত্বিক দিক আলোচনা করা, এই সেমিনারের বিষয় বস্তু হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

(৩) সভ্যতার সূচনা থেকে মানুষের প্রয়োজনে যে লোক শিল্প ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হলো, কোথা থেকে শুরু হলো, কি রূপ কলায় (Form) সৃষ্টি হলো, তখনকার পরিবেশ কেমন ছিল, তখনকার শিল্পীদের দর্শন বা মনোভাব কি ছিল, কি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে, এটা একমাত্র সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব। কারণ সেমিনারে প্রতিটি বিষয়ের উপরে গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আলোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে প্রতিটি বিষয়ের উৎস ও রূপান্তরের ধারা।

ফাউন্ডেশন আয়োজিত কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ তে লোকজ মেলার সাথে সাথে লোকশিল্পের উপর সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সেমিনারের জন্য ৬টি বিষয় নির্বাচন করা হয়েছিল। সেগুলো হলো (১) বাংলাদেশের

"মৃৎশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" শীর্ষক সেমিনারে সমাপনী বক্তব্য রাখছেন ফাউণ্ডেশনের পরিচালক জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া

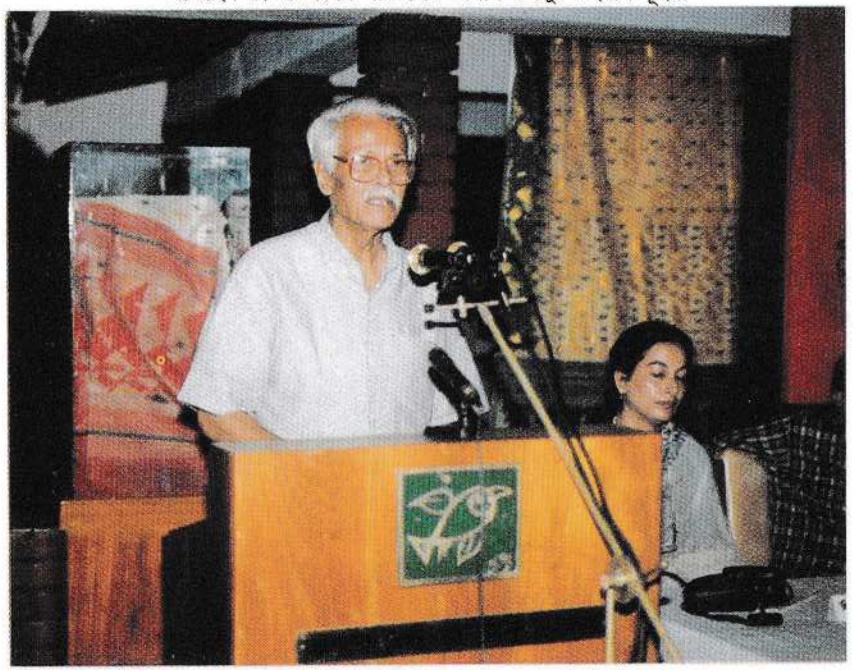

"জামদানীর অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব এমদাদ হোসেন

লোকজ খেলার অতীত বর্তমানও রূপান্তরের ধারা (২) জামদানীর অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা (৩) মৃৎশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা (৪) নকঁশী কাথার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা (৫) পাটজাত দ্রব্যের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা (৬) লোক ঐতিহ্যের অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা।

উক্ত বিষয়গুলির উপর সেমিনারের মাধ্যমে শিল্পগুলির গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে। সেমিনারের আলোচক ও প্রবন্ধকার সাধারণত লোকশিল্প লোকসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ, তাঁদের তথ্য ভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের আলোচনা ও সমালোচনায় বেরিয়ে এসেছে আমাদের শিল্প সংস্কৃতির ধারা বিবরণী। পূর্বের অবস্থা, পরিবেশ ইত্যাদি শিল্পের উৎস, কি ধরণের লোকজ পরিবেশ থেকে বা কোন ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশে এ সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ। বাংলার এ সমস্ত স্বনামধন্য শিল্প যা বিশ্বের বাজারে অনন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের জামদানী বস্ত্র শিল্প একসময় বাংলার ঐতিহ্যময় গৌরব নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাদের বিলাস বস্ত্র হিসাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তখনকার এই শিল্প কি ধরণের পরিবেশে গড়ে উঠেছিল, শিল্পীদের দর্শন কি ছিল, তাদের মনোভাব কি ছিল, কি কি পরিবর্তনের ফলে এর রূপান্তর হয়েছে তার বিবরণ। আধুনিক সভ্যতার চাপে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে বিদেশী সংস্কৃতির উপর আকর্ষণ এই মনোভাবের ফলে আমাদের শিল্প সংস্কৃতি কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এদেশের ঐতিহ্যময় শিল্প সংস্কৃতি কি কি সংকটের সম্মুখীন হয়ে এর গৌরব ম্লান হয়ে গিয়েছে, এ সকল সমস্যা বেরিয়ে আসে এই সেমিনারের আলোচনার মাধ্যমে। আর আলোচনার প্রেক্ষিতে যখন সমস্যা ধরা পড়ে তখন স্বাভাবিক ভাবে সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

কি ভাবে আধুনিক চমকপ্রদ বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালে তৈরী জিনিস পত্রের পাশাপাশি আমাদের লোক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? যেমন আমরা জামদানী বস্ত্রের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারার আলোচনায় পেয়েছি তাঁতীদের পূর্বাবস্থা অর্থাৎ তাদের আর্থিক, সামাজিক, পরিবেশগত দিক কেমন ছিল এবং এখন তাদের আর্থিক সংকট, পরিবেশগত সংকট কেমন ইত্যাদি। আমরা জেনেছি এর সংকট প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে, যার ফলে আমাদের দেশের এই একমাত্র ঐতিহ্যময় বস্ত্র শিল্প রীতিমত হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে আমরা যখন সমস্যা পেয়েছি তখন এর প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারি সরকারী, বেসরকারীও কোন সংস্থার উদ্যেগের মাধ্যমে। তাছাড়াও পত্র পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমেও এর সমস্যা তুলে ধরে প্রতিকারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া যায়।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের এই সেমিনার লোক শিল্পের বিস্তারে এবং এর সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত ফলপ্রসু পদক্ষেপ। এখানে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধ, এবং আলোচকদের সারগর্ভ আলোচনা যখন সাংবাদিকেরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে তখন আমাদের এই শিল্প সংস্কৃতির গুরুত্ব, এর

"লোক খেলাধুলার অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব এম এ রশিদ

প্রকাশ বিকাশ, এর সমস্যা সরকারী, বেসরকারী এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যন্ত সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে সেমিনার লোকজ সংস্কৃতি বিস্তারে অন্যতম পথ। তাই কারুশিল্প সামগ্রী ও সংস্কৃতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনে মৌলিক কারণেই সেমিনার অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের লোক বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞগণ, যথা- ডাঃ আশরাফ সিদ্দিকী, জনাব এম, এ রশিদ, জনাব হাবিবুল্লাহ্ পাঠান, বেগম মনিরা এমদাদ, প্রফেসর নিয়াজ জামান, জনাব এমদাদ হোসেন, জনাব মনিরুজ্জামান চৌধুরী, মোঃ সাঈদুর রহমান, ডঃ রফিকুল আলম, জনাব সাঈদ তালুকদার, প্রফেসর বুলবন ওসমান, প্রফেসার আব্দুর রাজ্জাক, জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া, সৈয়দ মাহবুব আলম, শ্রী বিশ্বনাথ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলেছেন। প্রতিটি বিষয়ের উপরে জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ সমাপনী ভাষণে উক্ত বিষয় সমূহের দিক নির্দেশনা করে সেমিনারের ধারাকে ভবিষ্যতের লোকশিল্পের সংরক্ষণ ও দলিলীকরণের ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী ও ফলপ্রসু প্রক্রিয়া হিসাবে ফাউন্ডেশনের মেলাতে সংযোজন করেছেন।

এই সেমিনারে শুধু আলোচনার জন্যই আলোচনা ঠিক তা নয়, এর উদ্দেশ্য, এর পরিকল্পনা অত্যন্ত বাস্তবমুখী। সেমিনারের গবেষণামূলক আলোচনা গুলি এক একটি বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করে এর ডকুমেন্টেশন করে একে ইংরেজী বাংলায় অনুবাদ করে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়া যাবে, গবেষণার জন্য দেশে বিদেশে এই ডকুমেন্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ যে কোন বিষয়ের গবেষণা করতে গেলে তার মূল উৎস, তার ধারা জানা প্রয়োজন। তাই আমাদের দেশের লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এগুলি উৎস থেকে শুরু করে রূপান্তরের ধারার দলিলীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই দলিলের উপর ভিত্তি করেই সামনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে। যে কোন দিক দিয়ে গবেষণা করতে হলে এই দলিল অত্যন্ত সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। তাই লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে প্রথম লোক সংস্কৃতির স্থায়ী বিস্তারের পদক্ষেপ হিসাবে লোক শিল্প অর্থাৎ লোক সংস্কৃতির উৎস ও বিবর্তনের ধারা দলিলীকরণের প্রয়াস নিয়েছে সেমিনারের মাধ্যমে।

অতএব এই সেমিনার লোকসংস্কৃতির স্থায়ী বিস্তারে একটি অন্যতম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। সংস্কৃতির রূপান্তর -গোপাল হালদার।
২। পরিচালক, জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়ার বক্তৃতার অডিও রেকর্ডিং, অডিও নং-১।

লোকজ খেলার স্বাজাত্য দর্শন এবং এর ভবিষ্যৎ কর্মধারা ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬

মোঃ রবিউল ইসলাম
সংরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি পরস্পরের সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একদিকে যেমন কতকগুলো দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে তেমনি তার সাংস্কৃতিক জীবন নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে তার দৈহিক অস্তিত্বকে। মানুষ কেবল তার জন্মগত সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই বাঁচে না, বাঁচে তার সামাজিক উত্তরাধিকার এবং সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থাৎ মানুষ তার আপন সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষভাবে বাঁচবার সুযোগ পায় এবং এই সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করে তার চাহিদা থেকে। সুতরাং মানুষের সৃষ্টি শক্তির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে তার চাহিদার প্রেক্ষিতে। এই সৃষ্টি শক্তির জন্যই মানুষ অন্য জীবের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

একথা সত্য জীববিবর্তন তথা সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহের মূলে কোন ইচ্ছা, উদ্দেশ্য অথবা পরিকল্পনা নিহিত আছে কিনা বিজ্ঞান তা বলতে পারে না। কারণ শুধুমাত্র যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিমাপ করা চলে, কেবল মাত্র সে সব বিষয়েই বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকতে পারে। তবে একথা বিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না যে, মানুষের অস্তিত্ব অভিনব। এই অসীম সৃষ্টি প্রবাহের সে শুধু অংশ হিসাবেই সত্য নয়, সে এই প্রবাহের মধ্যে জেগে ওঠা সচেতন সত্ত্বা, যে সত্ত্বা এই প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সমস্ত আশা আকাঙ্খা দিয়ে গড়তে চায়। আর এই গড়ার ইচছা থেকেই উদ্ভব হয়েছে মানুষের সংস্কৃতি। সুতরাং সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ চায় তার জীবনকে অর্থময় করে তুলতে।

মানব জীবনের প্রতিটি কর্ম, ব্যবহার ও আচরণের মধ্যে তার মানস সংস্কৃতি পরিপুষ্টতা লাভ করে। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ তার ধ্যান ধারণার লক্ষ্যে গভীর সত্যকে ও সৌন্দর্যকে জীবনাচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারেনা। সত্য ও সৌন্দর্যের এই প্রকাশ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাকেই বলা যেতে পারে সংস্কৃতির মৌল বিকাশ। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে বলা যায় মানুষ তার জীবন ব্যবস্থায় একই সামাজিক এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত হয় এবং হয় বলেই তার মধ্যে এক স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠে। সেই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সেই ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু জীবনের প্রয়োজন বোধ এবং সৌন্দর্যবোধ নিয়েই লোকজ সংস্কৃতি; সুতরাং লোকজ সংস্কৃতিতে এক স্বাতন্ত্র্যবোধ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে বিপরীত ভাবে বলা যায় স্বাজাত্য বোধ নিয়েই লোকজ সংস্কৃতি।

আমাদের লোক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, আমাদের প্রতিটি লোকজ উপকরণে অর্থাৎ লোকজ বস্তুতে, লোকজ খেলায়, লোকজ সংগীতে এবং সাহিত্যে এক স্বাতন্ত্র্য ধারা বিরাজ করছে। এটাই স্বাজাত্য বোধের দর্শন। পৃথিবীর সবদেশের অধিবাসীর মনেই স্বাজাত্য বোধ থাকে। এক এক জায়গার অধিবাসীদের একএক অঞ্চলে বসবাসের ফলে একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলার ফলে নিজেদের মধ্যে অনুভব করে একই সাংস্কৃতিক ও আবেগগত ঐক্য। এই ঐক্যের মাধ্যমে স্বাজাত্য বোধ জাগ্রত হয় এবং এই স্বাজাত্য বোধের দর্শন এক একটি দেশের এক একটি দিক থেকে উত্থিত হয়। এর উৎসও এক এক দিক থেকে হতে পারে। আমরা যদি সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology) অধ্যয়ন করি, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখা যাবে খেলাধুলার বিষয়াদি এক একটি দেশের স্বাজাত্য বোধের দর্শনের ভিত্তিতে সভ্যতা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। তাছাড়া আমরা যদি নৃবিজ্ঞান আলোচনা করি তাহলে দেখবো যে, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে লোকজ খেলা অর্থাৎ লোকজ খেলার উৎসই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন তাদের স্বাজাত্য বোধের নিদর্শন নিয়ে এগিয়ে এসেছে তেমনই আমরাও এই খেলাধূলা থেকে আমাদের স্বাজাত্য বোধের প্রকাশ বিকাশ ঘটিয়েছি। সুতরাং খেলাধূলাকে টিকিয়ে রাখতে হলে স্বাজাত্য বোধের দর্শন খুব গভীরভাবে থাকতে হবে। যদি এই দর্শনটুকু হারিয়ে যায় তাহলে এই খেলাধূলাও হারিয়ে যাবে, আর এ দর্শন যেহেতু স্বাজাত্য বোধের দর্শন যা খেলাধূলার মাঝে থেকেই এসেছে, তাও হারিয়ে যাবে। সেজন্য স্বাজাত্যবোধের দর্শনকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে লোকজ খেলার পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত দরকার।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সংগে খেলাধুলার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্ত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় খেলাধূলার মধ্যে। খেলাধূলা শুধু মাত্র পরিশ্রমের একটি অংগই নয় সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমেও খেলাধূলার মধ্যদিয়ে একটি জাতির একদিকে হয় সংস্কৃতির প্রসার এবং অন্যদিকে হয় সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ। খেলা আমাদের দেয় এনার্জি, গতি এবং বুদ্ধি। আর একটি জাতির সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এনার্জি, গতি ও বুদ্ধি দিয়ে। সুতরাং খেলা জাতি গঠনে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

বর্তমান বিশ্বে শিশুরা সীমিত সংখ্যক খেলাধূলা দেখছে বা খেলছে, ফলে তারা উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটানোর অবকাশ পাচ্ছেনা। তাছাড়া টি, ভি; ভি, সি, আর; ডিস এন্টেনা এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে একই জিনিস বার বার দেখানো হচ্ছে যার ফলে তার বাইরে শিশুদের চিন্তার অবকাশ থাকছেনা। এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা চিন্তা করে গবেষণা করে দেখেছেন যে, মানুষের মধ্যে যে ১৫০০ কোটি নিউরণ কোষ রয়েছে, সে নিউরণ কোষের কার্যধারার দ্বারা মানুষের চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে যার ফলে সে সৃষ্টি করতে পারে। একই জিনিস বার বার প্রত্যক্ষ করার ফলে সেই কোষগুলো Confined হয়ে পড়ছে, ফলে মানুষের উদ্ভাবনী

চিন্তা ভাবনা গুলোও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এটা দূরীকরণের জন্য লোকজ খেলা ধূলা চর্চা একটি উপযুক্ত মাধ্যম, যা একটি রাষ্ট্রের স্বাজাত্যবোধের দর্শনের ভিত্তিতে সেই রাষ্ট্রের নতুন প্রজন্মের অধিবাসীদের চিন্তা ভাবনা ও বুদ্ধি বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, যে সমস্ত খেলা হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে, যার মধ্যে এনার্জি, বুদ্ধি, গতি রয়েছে এবং যার উপর সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত খেলাকে নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপে পুনরায় যদি প্রচলন করা যায় তবে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে এবং সংগে সংগে জাতীয়তাবোধ প্রস্ফুটিত হবে।

বাংলার লোকজ খেলার ঐতিহ্য বহু পুরানো। আমরা সাহিত্যে এবং ইতিহাসে যে খেলাগুলো পাই, সে খেলাগুলো বহু পুরানো। এর কিছু কিছু প্রচলিত রয়েছে এবং অনেক খেলাই হারিয়ে গেছে। মানুষের সভ্যতার আগে থেকেই খেলা ছিল। সভ্যতার সংস্কৃতির উন্নতির সংগে সংগে খেলা চলে আসছে। এর মধ্যে কোন কোন খেলা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কোন খেলা পরিবর্তন হয়েছে এবং পাশাপাশি নতুন খেলারও প্রচলন হয়েছে। আমাদের এই খেলাগুলোর কতকগুলো প্রাচীন যুগের খেলা, কতকগুলো মধ্যযুগের খেলা এবং কতকগুলো বর্তমানের খেলা। যে গুলো প্রাচীন বা মধ্যযুগের খেলা, তা থেকে কিছু কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে বর্তমানের খেলা সেই সমস্ত খেলা তখন কি Form এ ছিল, বর্তমানে কি Form এ আছে এবং ভবিষ্যতে কি

কাঁচপুর ওমর আলী স্কুলের মেয়েদের 'ইছন-বিছন' খেলার একটি দৃশ্য

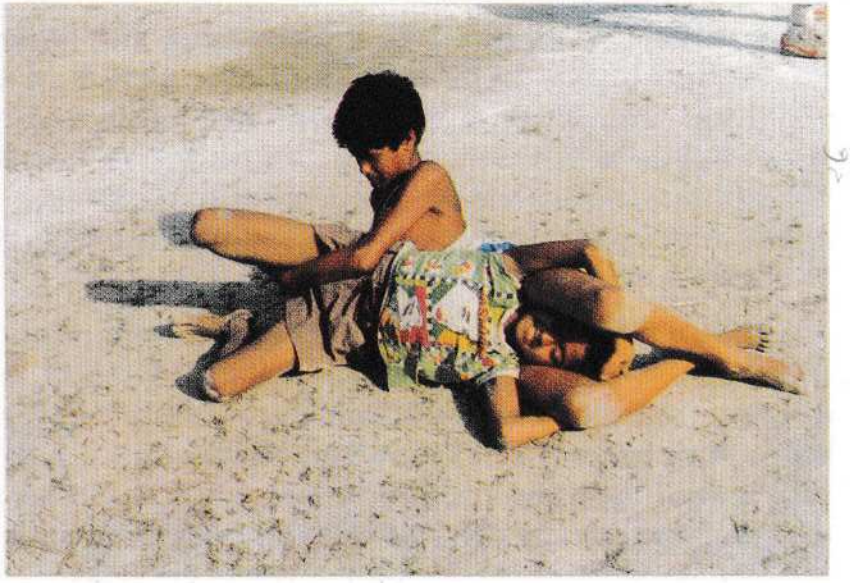

গ্রামীণ খেলা 'দোক খেলা'র একটি উত্তেজনাকর দৃশ্য

Form হতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের কিছু কিছু খেলা যা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে এবং কিছু আমাদের খেলাও বিদেশে প্রচলিত হয়েছে, এ গুলোর বিষয়েও গবেষণা প্রয়োজন। অর্থাৎ আমাদের লোকজ খেলাগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোর ভিডিও, সেমিনার এবং লেখা লেখির মাধ্যমে ডকুমেন্টশন প্রয়োজন, সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গত তিন বৎসর লোকজ উৎসবে স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দিয়ে গ্রামীণ খেলা পরিবেশন করছে। এ সমস্ত পরিবেশিত খেলা আলোকচিত্র ও ভিডিওর মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন করা হচ্ছে। এ বৎসর লোকজ উৎসবে খেলার উপর সেমিনার করা হয়েছে। সেমিনারে লোকজ খেলার প্রাসঙ্গিকতা, লোকজ খেলার নৃতাত্ত্বিক পটভূমি, প্রয়োজনীয়তা, খেলার Form ইত্যাদি বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয় এবং সেমিনারের আলোচকগণ একমত হন যে, লোকজ খেলার পুনরুজ্জীবন একান্ত ভাবে প্রয়োজন। ফাউন্ডেশন সেই আলোকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং গত তিন বৎসর ১০টি করে ৩০টি খেলা পরিবেশন করেছে।

গত তিন বৎসরে যে ত্রিশটি খেলা স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দিয়ে পরিবেশন করানো হয়েছে সে গুলো হলো -

হোসেনপুর হাইস্কুলের মেয়েদের 'চিত্তরাণী' খেলার একটি দৃশ্য

পাবনার লাঠি খেলার একটি দৃশ্য

(প্রথম বৎসর ১৯৯৪ সালে)

(ক) বৌচি, (খ) কানা মাছি (গ) গোল্লাছুট (ঘ) রুমাল খেলা (ঙ) এক্কা দোক্কা (চ) চিবুড়ি (ছ) নোন্‌তা (জ) এ্যাংগা এ্যাংগা (ঝ) টোক্কা টুক্কি (ঞ) কাঠি ছোঁয়া ছুঁয়ি।

(দ্বিতীয় বৎসর ১৯৯৫ সালে)

(ক) কইল্যা খেলা (খ) পালানটুক টুক খেলা (গ) এক পা খেলা (ঘ) মন পবনের নাও খেলা (ঙ) দাড়িয়া বান্দা খেলা (চ) ওপেনটি বাইস্কোপ (ছ) হাডুডু খেলা (জ) দোক খেলা (ঝ) লাঠি খেলা (ঞ) কলাগাছে ওঠা খেলা।

(তৃতীয় বৎসর ১৯৯৬ সালে)

(ক) আগডুম বাগডুম খেলা (খ) ফাঁদ পাতা খেলা (গ) চামড়ি খেলা (ঘ) ইছোন বিছোন খেলা (ঙ) আকুনি টুকনি খেলা (ঙ) রাজার কোটাল খেলা (চ) টুনি ভাইয়ের টুনি খেলা (ছ) মাকড়সার জাল খেলা (জ) চিত্তরানী খেলা (ঝ) আ কুৎকুৎ খেলা।

এ বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে যে খেলাগুলো পরিবেশন করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে প্রদান করা হলো ঃ

আগডুম বাগডুম খেলা ঃ আগডুম বাগডুম খেলা দলবদ্ধ খেলা। অন্তত চার-পাঁচ জন কি আরও বেশী খেলোয়াড় ঘরের বিস্তৃত মেঝে কিম্বা দালানে সকলকেই আসন পিড়ি করে বসতে হয়। তাদের মধ্যে একজন হয় দলপতি। এই দলপতি ছড়ার এক একটি শব্দ উচ্চারণান্তে এক একজনের হাঁটু স্পর্শ করে খেলা পরিচালনা করে। এক-একজনের হাঁটু একের পর এক স্পর্শ করে যাবার সময় প্রত্যেক খেলোয়াড় উৎকণ্ঠিত নজর রাখে দলপতির হাতের দিকে যাতে সে কোন ভাবে কাউকে এড়িয়ে যেতে ভুল করতে না পারে। নিজেদের হাটু দুটিকেও স্পর্শ থেকে বাদ দেয়া না হয়। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাঁটুতে এসে শেষ হয়, সে হাঁটু গুটিয়ে রাখে। যার দু হাটু আগে গুটানো হয়, তার স্থান প্রথম। শেষ খেলোয়াড়ের পরাজয় হয়। ছড়ার শেষ শব্দটি শোনার জন্য সকলের আগ্রহ থাকে। যেমন ঃ

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল কমলাপুলি।।

ফাঁদ পাতা খেলা ঃ এটি মেয়েলি খেলার অন্তর্ভূক্ত হলেও কখনো কখনো ছোট ছোট ছেলেরাও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। ফাঁদ পাতা খেলা শুরুর প্রাক্কালে দুজন মেয়ে পরপস্পর তাদের হাত দুখানি উঁচু করে ধরে ফাঁদের আকারে দাঁড়ায়। অন্যান্য খেলোয়াড় একে একে এই ফাঁদের ভিতর দিয়ে পার হতে থাকে এবং ছড়া আবৃত্তি করে। ছড়াটি যখন শেষ হয়, সেই মুহূর্তে ফাঁদের নিকটতম ছেলে বা মেয়ে ফাঁদে ধরা পড়ে। যে ধরা পড়ে তাকে দু'জনে দু'হাত ও দু'পা ধরে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এভাবেই পর্যায়ক্রমে খেলা চলে।

চামড়ী খেলা ঃ এই খেলাটিকে কাহিনীমূলক খেলা বলে আখ্যায়িত করা যায়। চামড়ি খেলা শুরুর পূর্বে খেলোয়ার দলের সর্দার মাটিতে পুকুরের মত একটি ছক কাটে। এরপর বিশ পচিশ জন খেলোয়াড় প্রত্যেকে হাতে একটি চিকন লাঠি নিয়ে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত ছকের চারপাশে সারি দিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়ানোর সাথে সাথে প্রতিপক্ষের একটি লোক লাঠি নিয়ে যখন ছকটি মুছে ফেলতে যায়, তখন প্রতিদ্বন্দ্বীরা বাধাদান করে। এতে উভয় দল ক্ষিপ্ত হয় এবং হাতের চিকন লাঠি দিয়ে মারামারি শুরু করে। এই মারামারি শেষ পর্যন্ত চমৎকার লাঠি খেলায় পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী ও তালের সাথে সাথে যখন এই লাঠি খেলা চলে, তখন সেই লাঠি খেলার তালকে অনুকরণ করে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকে। এই ভাবে কিছুক্ষণ খেলা চলার পর এক সময় দু'পক্ষ আকাশের দিকে হাতের লাঠি উঁচিয়ে ধরে এবং সাথে সাথে তাদের মধ্যে আপোষ হয়। আপোষসূত্রে তারা ছকটির মধ্যে একখানা গামছা লম্বালম্বিভাবে ফেলে দিয়ে পুকুরটিকে দু'ভাগ করে। অতঃপর উভয় পক্ষ মাছ ধরা শুরু করে। এই মাছ ধরার দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলার জন্য যে কোন দলের একটি লোক উক্তস্থানে পানি ঢেলে দেয় এবং সেই পানিতে হাত পা নোংরা করে সকলে মাছ ধরার জন্য হাতা হাতি শুরু করে। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ মাছ ধরার জন্য কাদায় লুটোপুটি খেতে খেতে একসময় যে কোন দলের একটি লোক হাতে শিং মাছের কাঁটা বিঁধেছে বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, লোকটার চিৎকার ও কান্নাকাটি সহ্য করতে না পেরে, দলের একজন লোক ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার এসে রুগীকে ঝাড়ফুঁক করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তাই আহত খেলোয়াড়টি দ্বিগুন ব্যথায় চিৎকার করে বলে ওঠে, আউগাও মাইয়া আউগাও। শিংগির বিষে মরিয়া গেনু মুই।

রোগীর চিৎকার শুনে স্নেহময়ী মাতার কলিজা ফেটে যায়, সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছেলের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তাকে সেবা করে। কিন্তু মাতার প্রানঢালা সেবাতেও সুস্থ হয় না। চিৎকার শুনে শেষ পর্যন্ত ষোড়শী যুবতী তার রূপের ঝলক নিয়ে লোকটির সামনে এসে দাঁড়ায় ও বাঁকা নয়নে মুখে স্মিত হাসি নিয়ে রোগীর দিকে তাকায়। এরপর উভয়ের চোখে চোখে যে কথার ও ভাবের বিনিময় হয়, তাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। অতঃপর খেলাটি এখানেই শেষ।

সম্ভুপুরা হাইস্কুলের মেয়েদের ফাঁদ-পাতা খেলার একটি দৃশ্য

কাঁচপুর ওমর আলী স্কুলের মেয়েদের চামড়ী খেলার দৃশ্য

মোগড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েদের "মাকড়শার জাল" খেলার একটি দৃশ্য

সোনারগাঁ জি, আর, ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্রীদের ইছন-বিছন খেলার একটি দৃশ্য

ইছোন বিছোন খেলা ঃ ইছোন বিছোন ছোট মেয়েদের মধ্যে বহুল প্রচলিত খেলা। ৫/৭ জন মেয়ে বৃত্তাকারে বসে একে একে সকলে মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত উপরে উপরে স্থাপন করে এক দেড় হাত উঁচু করে কল্পিত গাছ তৈরী করে। দলের কেউ মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলোর নীচে এক হাতে কয়েকবার কোপ দিয়ে গাছ কাটার ভঙ্গীতে বলে; তালগাছ কাডি, গুয়াগাছ কাডি হুড়মুড়। তৎক্ষনাৎ গাছ ভূমিস্মাৎ হয় অর্থাৎ সকলে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছেড়ে দেয়। অতঃপর সকলে দু'হাত উপুড় করে মাটিতে বিছায়, একজন নীচের ছড়ার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি বিছানো হাতের উপর মৃদু কিল দেয়,

ইছোন বিছোন দারগা (দরন) বিছোন
সুব (সুয়া) লড়ে গাইল' লড়ে।

ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাতের উপর পড়ে, সে হাত উঠিয়ে বুক পেটের কাছে গুটিয়ে রাখে। পুনরায় ছড়া কেটে পূর্ব প্রক্রিয়ায় খেলা চলে।

আকুনি টুকুনি ঃ এ খেলাটি দলবদ্ধ খেলা। এজন্য অন্তত আট দশটি ছেলে মেয়ে গোলাকার বৃত্তাকারে হাঁটু গেড়ে বসে। আর একজন থাকে মাঝেখানে দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানো খেলোয়াড়ের হাতে থাকে মার্বেলের সমান ছোট ন্যাকড়ায় কাগজের পুঁটলী। সে সেই পুঁটলী উপবিষ্ট খেলোয়াড়দের কোন একজনের হাঁটুর নীচে এমনভাবে লুকিয়ে রেখে আসবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে কার কাছে রাখা হলো। পুঁটলী লুকানো হয়ে গেলে দাঁড়ানো খেলোয়াড়দের একজন একজন করে ডাকা হয় এবং তাকে বলা হয় কার কাছে পুঁটলী আছে তা বলে দিতে। বলতে না পারলে সে হেরে যায়। তখন সে পুঁটলি নিয়ে দৌড়ে যায়। অন্যেরা ছোটে তাকে পাকড়াও করে আনতে, পুঁটুলী কার কাছে আছে তা বলতে বলা হয় ছড়ার সাহায্যে- আকুনি টুকুনি সত্তরের গাছের ভূতনী।

রাজার কোটাল খেলা ঃ রাজার কোটাল খেলা একটি সমাজ কেন্দ্রিক খেলা। এর ভেতর দিয়ে জনসাধারণ রাজার কোটাল কর্তৃক কিভাবে অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হয়েছিল, তারই স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। খেলাটি অভিনয়মূলক খেলার আওতাভূক্ত।

ছলাকলায় রাজার কোটাল গৃহস্থের কাছ থেকে কখনো কলা, কখনো পেঁপে, আম, কাঁঠাল, তরিতরকারী নিয়ে যায়। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা এ ছবি বাস্তবে দেখেছে, খেলার মধ্যে তারই অনুকরণ করে থাকে।

'রাজার কোটাল' ছেলে-মেয়েদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় খেলা। তারা একত্রে এ খেলাটি খেলে থাকে। খেলার প্রারম্ভে একজন দলপতি নির্বাচিত হয়। খেলার ভাষায় এই দলপতিকে 'রাজা' বলে। রাজা ছাড়া এই খেলায় বিশেষ চরিত্রের আর একজন খেলোয়াড় থাকে। সে 'কোটাল' নামে পরিচিত।

খেলার শুরুতেই রাজা বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়ে একস্থানে গোল হয়ে বসে। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা তাদের হাত মুঠো করে রাজার হাতের উপর রাখে। কোটাল বৃত্তের চারধারে ঘুরতে থাকে। এরপর রাজা ও কোটালের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়।

রাজা ঃ কান্‌টার পিছে কে ঘুরে?
কোটাল ঃ রাজার কোটাল।
রাজা ঃ কিসের জন্য?
কোটাল ঃ এক ছড়ি কলার জন্য।

কথোপকথন শেষ হওয়ার সংগে সংগে কোটাল একজনের মুষ্টিবদ্ধ হাত কলার কাঁদির মত করে সামান্য তফাত রাখে। কোটালি আবার চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ও রাজার সংগে পূর্বোক্ত কথোপকথন শুরু করে। এমনিভাবে কোটাল সব খোলোয়াড়কে নিয়ে গেলে প্রথম বারের মত খেলাটি শেষ হয়।

টুনি ভাইয়ের টুনি খেলা ঃ প্রবীণ গবেষক আব্দুল হক চৌধুরী লিখেছেন, এই খেলাটি ৮ থেকে ১০ বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ৪/৬টি ছেলেমেয়ে এক জায়গায় গোল হয়ে দু'হাত জোড় করে বসে। তাদের একজন প্রথম পক্ষ হয়। আর একজন হয় দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষ ছোট একটি মাটির গুটি বৃদ্ধ ও অনামিকা আঙ্গুলে ধরে দু'হাত জোড় করা ছেলে-মেয়েদের মুঠোর ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওটি রাখার ভান করে ছড়া কাটে–

টুনি ভাইয়ের টুনি
হরবা গাছের বুনি
কত লে আছে
কত লে নাই,

বলে একজনের হাতের ফাঁকে গুটি ঢুকিয়ে দিয়ে অপর একজনের হাতে দিয়েছে বলে থাপ্পর দিয়ে নির্দেশ করে। তখন দ্বিতীয় পক্ষ প্রথমবারের কারো হাতের ফাঁক থেকে

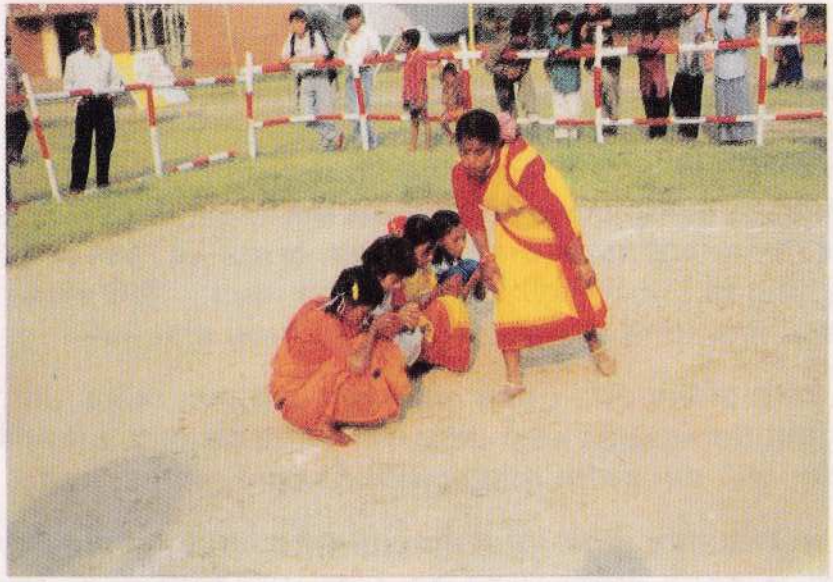

টুনি ভাইয়ের টুনি খেলা খেলছে শারমিন টেক্সটাইলের মেয়েরা

সোনারগাঁ পাইলট স্কুলের মেয়েদের আগডুম-বাগডুম খেলার একটি দৃশ্য

গুটিটি বের করে দিতে পারলে জিতে যায়, আর না পারলে হেরে যায়, এভাবে খেলা চলতে থাকে।

মাকড়সার জাল খেলা ঃ কৌতুকপ্রদ খেলার মধ্যে মাকড়সার জাল খেলা একটি। খেলাটির বিবরণ পেশ করেছেন শংকর সেনগুপ্ত। তাঁর ভাষায় মাকড়সার জাল খেলায় একটি শিশু মাকড়সা হয়ে বসে থাকবে। বুনবে। অন্যরা মাছি হয়ে জুড়ির হাত ধরে ঘুরে বেড়াবে। 'নিরাপদ স্থান' বলে একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে। মাকড়সা মাছিদের দেখে তাড়াবার জন্য লাফিয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে মাছিরা দৌড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবে। যাবার সময় বলবে, "ব্যাঙ বলে ঘ্যাসু, কুচে বলে হরি, কোন্ পথদে যাব আমি বোনাই শালার বাড়ী। বোনাই শালা ভাত দেলনা, মারল জুতার বাড়ি, জুতা গেল ফস্‌কে বোনাইর নাম বক্‌সে" এই ভাবে আবৃত্তি করতে করতে দৌড়ে নিরাপদ স্থানে পৌছানোর আগেই যদি মাকড়সা কাউকে ধরে ফেলতে পারে সে বা তারা হবে মাকড়সার ছানা। তখন তারা বলবে, চেলা মাছে খেলা করে, বাগদী মাছের দাড়ি। কোন পথে যাব আমি, বড় বোনাইর বাড়ী? কিন্তু যেতে পারে না। আবার যখন মাকড়সা মাছিদের তাড়া করবে তখন ছানারাও তার সংগে থাকবে। এভাবে যখন যাদের ধরতে পারবে তারাই হবে মাকড়সার ছানা। মাছিদের সংখ্যা কমে গেলে খেলা শেষ হবে।

চিত্তরাণী খেলা ঃ পূর্ব ময়মনসিংহের জনপ্রিয় খেলা চিত্তরাণী। খেলাটি অবিকল হা-ডু-ডু খেলার মত হলেও হা-ডু-ডু এর সাথে এর যথেষ্ট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। খেলাটির খেলোয়াড়রা হা-ডু-ডুর মত দু'টি দলে বিভক্ত হয়। তবে মজার ব্যাপার এই যে, হাডুডুর মত দম নিয়ে এতে কেউ প্রতিপক্ষের শিবিরে হানা দেয় না। এতে দম না নিয়ে প্রতিপক্ষের এলাকায় প্রবেশ করা যায়, প্রতিপক্ষের এলাকায় প্রবেশ করে যদি কাউকে ছুঁয়ে আসা যায়, তবে হাডুডুর মতই সে মারা যায়।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করাই চিত্তরাণী খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আকুৎ কুৎ খেলা ঃ আকুৎ কুৎ শব্দটি গ্রামে কুকুরকে ডাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই খেলাটি অনেকটা লাই খেলার মত হলেও ডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হয় ৫/৭ জন ছোট মেয়ে বৃত্তাকারে বসেও একজন নীচের ছড়ার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে। ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকের হাঁটু স্পর্শ করে।

আইকম, বাইকম তাড়াতাড়ি,
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ী।
রেলগাড়ী ঝমা ঝম।

ছড়ার শেষ শব্দ 'ফুল' উচ্চারণের সময় যার হাঁটু স্পর্শ করা হয়, সে হাঁটুর উপর হাত রাখে, এভাবে ৮/১০ বার ছড়াটি বলার পর যখন সবার হাত হাঁটুর উপর রাখা সমাপ্ত হয়, তখন সকলে দু'হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। ওঠার সময় সন্ধিস্থল ফুটলে (শব্দ হলে) সে কুত্তা হয়। কুত্তা নির্বাচিত হওয়া মাত্রই অন্যরা তার ছোঁয়া থেকে বাঁচবার জন্য তৎক্ষণাৎ ছুটে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে আকুৎ কুৎ কেন ফেন খাইয়া লুৎ লুৎ এই ঘৃণাসূচক ছড়া কাটে। কুত্তা যাকে ছোঁয় সেই কুত্তা হয়, এভাবে ঘৃণাসূচক ছড়া কেটে কেটে অনেকক্ষণ খেলা চলে। কাউকে ছোঁয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজ কান ধরে মাটিতে বসে পড়লে সে পরাজিত বলে গণ্য হয়। এভাবে খেলা চলে।

যেহেতু বর্তমান বিশ্বের শিশুরা টিভি; ভি, সি, আর; ডিস এন্টেনা; ইত্যাদির মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক খেলা বা একই জিনিস বার বার দেখে তাদের উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনাগুলি Confined হয়ে পড়ছে, সেহেতু সমস্ত লোকজ খেলাধূলার পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যক। সেই প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন লোকজ খেলা পুনরুদ্ধারকল্পে দেশব্যাপী কর্মধারা নিয়েছে। এই কর্মধারায় লোকজ খেলার উপর জরীপ করে খেলা সংরক্ষণ করবে এবং দেশের প্রত্যেকটি স্কুলে সেই সমস্ত সংরক্ষিত খেলাকে গবেষণার মাধ্যমে রূপান্তরিত Form-এ তাদের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করে পরিবেশন করানোর প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া লোকজ খেলাধূলার উপর ভি, ডি,ও এবং শর্ট ফিল্ম করে সেগুলো দেখানো যেতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করে শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে স্কুল গুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া লোকজ খেলার উপর আরও সেমিনার সিম্পেজিয়াম করে গবেষণার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া যায়, এভাবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে লোকজ খেলার উপর সুনির্দিষ্ট প্রকল্প নিয়ে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করে ছড়িয়ে দিতে পাড়লে Traditional Culture এর শুধু বিস্তারই ঘটবে না, সংগে সংগে স্বাজাত্য বোধের দর্শন আরও পরিপক্কতা লাভ করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঙালীর খেলাধূলা, শঙকর সেনগুপ্ত, ১৯৭৬; পৃঃ -৯

২। বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধূলা, সামীয়ূল ইসলাম।

৩। সেমিনার "লোকজ খেলার অতীত বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" আলোচক-জনাব এম, এ রশিদ, সভাপতি জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন।

৪। পরিচালক, জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়ার বক্তৃতার অডিও রেকর্ডিং, নং ১।

লোক মেলার প্রসারে লোকজ উৎসব ঃ প্রেক্ষিত লোকজ উৎসব '৯৬

জসিম উদ্দিন
প্রর্দশন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধতার উন্মেষ ঘটে এসেছে বাঁচার তাগিদে, জীবন ধারণের তাগিদে। এই কারণে মানুষ শিল্প সৃষ্টির ও প্রয়োজন বোধ করেছিল। এই সুত্রে আজও জীবনের সুখ দুঃখ রস বোধ আনন্দ হাসি গানের ভিত্তি হিসাবে শিল্প বেঁচে রইল মানুষের মাঝে। আজও তা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি এবং বাঁচার প্রয়োজনে ব্যবহার করছি।

মানুষের সংঘবদ্ধতার উপলব্ধি এবং তাঁর শিল্পবোধ একে অন্যের পরিপূরক। উপরোক্ত যে কোন তাগিদেই হোক অনেক মানুষ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন আদান প্রদান, সুখকর কর্মকান্ড, চিত্তাকর্ষক শিল্প নৈপুণ্য উপভোগকরা, ব্যবহৃত দ্রব্যাদির চাহিদা মেটানো ইত্যাদি বিষয়ের টানে মানুষ মেলায় আসে। মেলা আমাদের লোক সংস্কৃতির অন্যতম বাহন। বিপুল বিচিত্র উপাদানে আমাদের লোক সংস্কৃতির ভান্ডার সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের সামাজিক ও ভূপ্রকৃতির বিন্যাস, জনবসতির ধরণ ও বৈশিষ্ট্য, এর লোক সমাজের আচার বিশ্বাস, সংস্কার এবং মানসিক ও মনস্তাত্বিক গঠণের বিশাল পরিমন্ডলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই বিচিত্র বহু মাত্রিক এবং নিজস্ব গতিশীলতায় সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতি।

লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের (ব্যবহারিক, দৃশ্যমান, বস্তুগত, অবস্তুগত) সমন্বয়েই লোকজ উৎসবের আয়োজন। মেলার সমৃদ্ধি এবং প্রসারের জন্যই উৎসব। এক কথায় মেলার মূলেই উৎসব নিহীত।

পুরানো দিনের ঐতিহাসিক, সামাজিক বিষয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আদি জনগোষ্ঠী সহ নানান উপজাতির সমন্বিত লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে মেলার আয়োজন চলতে থাকে।

উৎসবের আনন্দে মেলা হয় পরিপূর্ণ। উৎসব বিহীন কখনো কোথাও মেলা হয়নি। মেলাকে অনেকে অনেক ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছন। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গীয় শব্দ কোষে, "মেলা শব্দের অর্থ মিলন, সমাগম। এ ছাড়া পর্বাদিতে বা উৎসবের জন্য বহু লোকের সমাগম; তাদৃশ লোক সমাগম উপলক্ষে বাজার, এই সব কিছু মিলিয়েই মেলা"।

প্রত্যেক মেলার ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ জায়গায়, যেখানে লোক সমাগম উপলক্ষে মেলা বসে থাকে। বাংলাদেশের মেলার এই বিষয়টি একটি বিশেষত্ব। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও বহু মানুষের জীবিকার সঙ্গে মেলা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত নয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশের মেলার মতো সংযুক্তি আর কোথাও নেই। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের মেলা মানেই বিশেষ বিশেষ জায়গার মেলা। সে জায়গা এবং সময়ের কথা বাদ দিলে মেলার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা। মেলা তথা লোক মেলা বাংলাদেশের লোকউৎসব।

বিভিন্ন কিংবদন্তী, গ্রামীণ রেওয়াজ, ধর্মীয় পালা পার্বণকে ছাড়িয়েও লোক মেলার মধ্যে রয়েছে জীবীকার এক বিশাল সংস্পর্শ। এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বিস্তৃত।

বিভিন্ন লোকজ উৎসব সাধারণত মেলা, ধর্মীয় ঘটনা, কিংবদন্তী, লোকজ ঐতিহ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। মিঃ বেন্টলী (জনৈক ইংরেজ লেখক) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলেছেন যে, "গ্রামে মেলা উপলক্ষে যাত্রাগান, কবিগান, জারিগান এবং আউল বাউলের গানের আসর বসে। গ্রামীণ শিল্পীদের গান গাওয়া এবং গ্রামের মহিলাদের নকশি বাহার কারুকাজময় হরেক রকমের পণ্য এসব মেলার আকর্ষণ।"

মেলা প্রসঙ্গে আমাদের রয়েছে এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস। মেলা সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মেলা প্রসঙ্গে আইন-ই আকবরীতে মোঘল আমলের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাতে উল্লেখ আছে যে, "এদেশে এমন কোন গ্রাম নেই যাতে মেলার ধূম পড়ে যায় না।" বিভিন্ন মৌসুমের রকমারী দ্রব্যসামগ্রীর সাথে মানুষের মহামিলনই মেলার প্রধান উপভোগ্য বিষয়। মেলাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব তার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিগান, ভাটিয়ালী, বেহুলা গাজনের গান, গাজীকালুচম্পাবতী, সত্যপীরেরগান, যাত্রা, কীর্তন, লেটোগান, আলকাপগান, গম্ভীরা ইত্যাদি।

এর পাশাপাশি ছিল নাগরদোলা, চড়কগাছ, লাঠি খেলা, কুস্তি, মোরগ-লড়াই, ষাড়ের লড়াই, কিংবা নৌকা বাইচ, ঘোড়দৌড় যা মেলাকে মুখরিত করে রাখতো। নানান ধরনের মিষ্টি, মোয়া, মুড়ি মুড়কি, জিলাপী এসবও মেলা ও উৎসবের অলংকার ছিল। মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের সৃজনশীল সৃষ্টির বিকাশ ঘটেছে।

শুধু পুরানো দিনেই নয় মেলা আজও তার প্রকৃতি এবং স্বভাব নিয়েই চলেছে। এখনো মানুষ আজন্ম বিশ্বাসের কারণে মেলার উৎসবে ছুটে আসে। কিছু সময় কাজ থেকে অবসর নিয়ে সকল মানুষ মেলাকে মুখরিত করে তোলে। মুক্ত মাঠের মুক্ত আলো বাতাসে উৎসবের আনন্দ নিয়ে আপন জনের সাথে মেলা মেশার সুখ অনুভব করে। উৎসবের আকর্ষণে বিনোদনের তীর্থ হিসাবে আজও মেলা একটি সার্বজনীন উৎসব। গ্রাম বাংলার সেই উৎসব থেকেই আজ শুরু হয়েছে শহরে নগরে মেলার উৎসব।

২

মেলাকে চিরায়ত মেলা হিসাবে না দেখে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তমূলক মেলায় রূপান্তরিত করতে গেলেই বস্তু প্রদর্শনীর বিকাশ দরকার। মানুষ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত

গল্প বলা অনুষ্ঠানে গল্প বলছেন মোয়াজ্জেম আলী

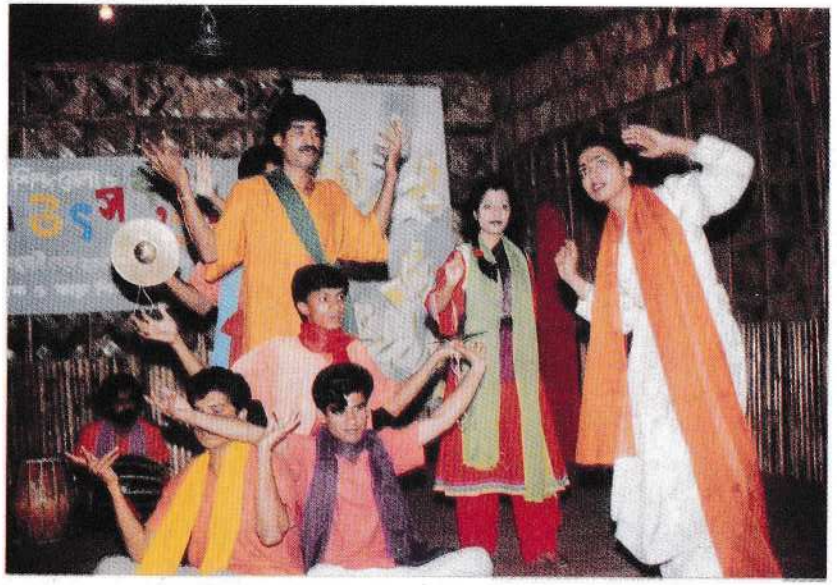

গীতি-নাট্য পরিবেশন করছেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা

হবে তার সৌন্দর্যের জন্য, তার বাণিজ্যিকিকরণের জন্য। মেলাতে এসে মানুষ ঐ বস্তু সংস্কৃতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ততার বৃত্তে সীমা বদ্ধ থাকতে চায় না। মেলাতে মানুষ চায় এমন আনন্দধারা যেটা মানুষকে সজীব করে মানুষের মনকে উদ্দীপ্ত রাখে। মানুষের প্রতিটি কাজকে গতিশীল রাখার জন্য এমন কিছু উপস্থাপনার প্রয়োজন যা মানুষের জানা নেই কিংবা জানা আছে, কিংবা কল্পনায় আছে। মানুষ যে সমস্ত বিষয় বার বার দেখতে চায় এবং উপভোগ করতে চায়, সেই বিষয় গুলি মেলায় সমাবেশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশের মেলায় উৎসবের আয়োজন থাকাটা স্বাভাবিক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশের প্রাচীন মেলা থেকে এ পর্যন্ত যত মেলা হয়েছে বা হচ্ছে তার সবগুলিই উৎসবে পরিপূর্ণ। সে প্রেক্ষিতে মেলাকে দুর্বারভাবে আকর্ষণ করার জন্য উৎসবের আয়োজনের যথেষ্ঠ যৌক্তিকতা রয়েছে। উৎসবের আনন্দে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে, এর সঙ্গে থাকে বেচা কেনার আনন্দঘন পরিবেশ। পেছনে না গিয়ে আজকের দিনের মেলা দেখলেও সহজে অনুধাবন করা যায় যে মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য এবং তার সুষ্ঠু পরিচালার জন্য একদল উদ্যোক্তা থাকে, যার ভিত্তি পুরোপুরি বাণিজ্যিক। তাঁরা মানুষের আকর্ষণের জন্য নানান আয়োজন করে। মানুষ বৈচিত্র্যহীন এক ঘেঁয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের সন্ধানে মেলায় ছুটে আসে।

বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে যেমন মেলার সূত্রপাত তেমনি মেলাকে অর্থবহ এবং বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসবকে বৈচিত্র্যময় নতুন আঙ্গিকে প্রতিবছর ঢেলে সাজানো হয়।

৩

লোক সংস্কৃতি-লোক ঐতিহ্য, এবং কারুশিল্পের প্রসারের জন্য বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে। ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্যই হলো এই সব কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন।

লোক কারুশিল্পের প্রসারে ফাউন্ডেশন প্রতি বছর ব্যাপক আয়োজন করছে। অবশ্য ১৯৯১ সাল থেকে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের আঙ্গিকে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন এবং নতুনত্ব। ফাউন্ডেশন মেলার প্রসারে উৎসবকে প্রাধ্যন্য দিয়ে মেলার পরিবেশকে করেছে আরো প্রাঞ্জল এবং অর্থবহ।

ফাউন্ডেশনের মেলায় বিক্রয়ের জন্য আসে কারুশিল্প, হস্তশিল্প, বস্ত্রসামগ্রী, কৃষিজাত দ্রব্য, শিশুদের খেলনা, মুড়ি মুড়কি, মিষ্টি জিলাপি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য। এর মধ্যে কিছু শুধু মেলাতেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফাউন্ডেশনের মেলাকে উপলক্ষ্য করে কারুশিল্পী, হস্তশিল্পী, কারিগর ও উৎপাদকরা তৈরী করে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য। মেলাকে একটি গবেষণাধর্মী প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের জন্য ফাউন্ডেশনই প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছে। ফাউন্ডেশন লোকমেলার প্রসারে উৎসবকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছে। উৎসবের মধ্যে নতুনত্ব আনয়ন, হারানো দিনেরঐতিহ্যকে প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য লোকসঙ্গীতকে ফাউন্ডেশন আজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মর্যাদার শীর্ষেই

পালাগান পরিবেশন করছেন আকলিমা

রেখেছে। এর মধ্যে পালাগান, জারীগান, সারীগান, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা গান, কবিগান, আলকাপ গানের আসরগুলি ছিল দৃষ্টান্ত মূলক। লোক সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা ধর্মী প্রক্রিয়া, সুন্দর উপস্থাপন হাজারো দর্শকের মন কেড়েছে। এর মধ্যে লোক সঙ্গীত শিল্পী আঃ রহমান রয়াতী, কুদ্দুস বয়াতী, শামছু বয়াতীসহ বিভিন্ন আঙ্গিকের শতাধিক শিল্পীর পরিবেশনা ছিল '৯৬ এর লোক উৎসবের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। ফাউন্ডেশনের ১৯৯৬ এর উৎসব যেমন দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে তেমনি মেলাকেও এই উৎসব প্রসারিত করেছে বহুলাংশে। এ ছাড়াও দেশের জানা অজানা অনেক প্রতিভাবান গ্রামীণ শিল্পীকে পরিচিতি দেয়া হয়েছে আজকের সমাজে, শিল্পীরা আর্থিক ভাবেও কিছুটা উপকৃত হয়েছেন। এবারের মেলায় কুদ্দুস বয়াতীর একক পালাগান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শামছু দেওয়ান ও তাঁর প্রতিপক্ষের পালাগানের আসরে সহস্রাধিক দর্শকের সমাগমে মেলার অঙ্গন ছিল পরিপূর্ণ। লোকসঙ্গীত ছাড়াও লোক সাংস্কৃতিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রামীণ আঙ্গিকের নাটক ছিল বিশেষ প্রশংসনীয়। নাটকের দলটি ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সমন্বয়ে একটি দল। তাঁরা দেওয়ানা মদিনা মঞ্চস্থ করিছিল পৌরানিক ধাঁচে। আজকের সংস্কৃতির সংকটে দর্শকদের সুন্দর সুষ্ঠু একটি মৌলিক ধারার উপস্থাপনায় আনন্দিত করেছে এ লোকজ নাটক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সেলিম আলদীনের নেতৃত্বে উল্লিখিত নাটকটি প্রদর্শিত হয়েছিল। এছাড়া যাত্রা সহ বিভিন্ন লোকজ খেলাধূলা ও জীবন্ত প্রদর্শনী, বিশেষ কারু প্রদর্শনী সংদের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল দৃষ্টান্ত দেয়ার মত। ফাউন্ডেশনের '৯৬ মেলায় সকল কিছুতেই নতুনত্ব আনা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে সং এবং জীবন্ত প্রদর্শনীর বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সং আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের একটি প্রাচীন চরিত্র। লোকজ জীবনে সং এর ভূমিকা সম্পর্কে আমরা জানি যে হাস্য কৌতুকে অঙ্গভঙ্গিতে মাতিয়ে রাখে পুরোপরিবেশ। মেলাতে সংদের বিভিন্ন কার্যকলাপ হাস্য কৌতুকেরও যথেষ্ঠ যৌক্তিকতা রয়েছে, মেলার চিরায়ত রূপকে আরো প্রাণবন্ত করতে সং এর উপস্থিতিতে দু'টি বিষয় পরিলক্ষিত হয়

প্রথমত ঃ প্রাচীন ঐতিহ্যকে রূপান্তরিত করে আজকের শতাব্দীর একটি মেলার সংযোজন।

দ্বিতীয়ত ঃ কষ্টকর শারীরিক কসরতপূর্ণ গ্রামীণ খেলা এবং প্রচলিত লোকজ অনুষ্ঠানের সঙ্গে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি বাড়তি খোরাক। গত বছর দু'জন সংকে মেলা প্রাঙ্গণে আনা হয়েছিল। এ বছরে আরো দু'জন সংকে খুঁজে বের করে আনা হয়েছে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য, সে সঙ্গে দর্শকদেরও পুরানো ঐতিহ্যের আস্বাদে পরিপূর্ণ আনন্দ দানের জন্য।

গাজীর পালা গাইছেন জব্বার বয়াতি

শুধু সংই নয় লোকজ ঐতিহ্যের বিকাশমূলক গবেষণাধর্মী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকমেলার প্রসারের জন্য দৃষ্টান্তমূলক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে লোক সঙ্গীত, পালাগানের আসর, লোকজধারায় আধুনিক নাটক, যাত্রা, ইত্যাদিতে সহস্র দর্শক আনন্দ পেয়েছে। অনুষ্ঠানের টানে মেলা প্রাঙ্গণ ছিল লোকারণ্য। উৎসবের পরিপূর্ণতার জন্য ফাউন্ডেশন উৎসবের আঙ্গিকে নতুনত্ব এনেছে আরো ব্যাপকভাবে। জীবন্ত প্রদর্শনী, গ্রামীণ খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, কারুপ্রদর্শনী ইত্যাদিতেও আনা হয়েছে বৈচিত্র। এই কর্মকান্ড দর্শকদের মধ্যে ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি মহত্ববোধ জাগ্রত করা, হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

লোকজ উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গ্রাম বাংলার অদেখা অজানা যে সকল প্রতিভাবান শিল্পী সরল সাবলীল এবং স্বাভাবিক ভঙ্গীতে তাদের গান, কবিগান, পালাগান, ইত্যাদি পরিবেশন করেছেন, তাদের উপস্থাপনায় মেলার আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যে এনেছে বৈচিত্র্য। অবশ্য মেলার অঙ্গনকে আরো পরিপূর্ণ ভাবে লোকজ ঐতিহ্যমন্ডিত ভাবে সাজানোর জন্য লোকজ পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের জন্য বৈচিত্রময় কারুমঞ্চ তৈরী করা হয়েছে।

লোক নাটকের একটি দৃশ্য

কবি গান পরিবেশন করছেন চট্টগ্রামের কবিয়াল সাধন আচার্য্য

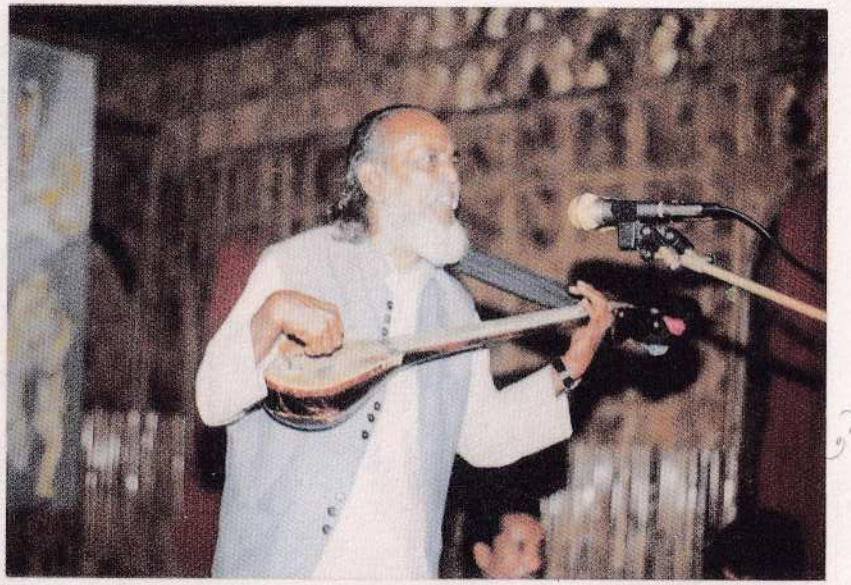

লোক সংগীত পরিবেশন করছেন সোনামিয়া বয়াতি

এবারের উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার মধ্যে ছিল লোকজ সংস্কৃতির আদি ধারা, মধ্যপর্যায়ের এবং বর্তমানের রূপান্তরের ধারা। মধ্যযুগের পালাগান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার ভঙ্গী বৈশিষ্ট্য, আকার কি ছিল এবং আজকের আধুনিক সময়ে সেই একই বিষয় বস্তু নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের দিয়ে লোকজ ধারায় কিভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এমনি করে লোকজ খেলাধূলার ও গবেষণাধর্মী উপস্থাপনা ছিল উৎসবের ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক। ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলাধূলার রূপান্তরের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ফাউন্ডেশনই ব্যাপক ভাবে প্রকাশ করেছে। সেই প্রাচীন কাল থেকেই বাণিজ্যিক কারণেই মেলার সুরু। আর মেলাকে জমানোর জন্যেই প্রয়োজন হয় উৎসব কেন্দ্রিক বিচিত্র লোকজ অনুষ্ঠান, তন্মধ্যে লোকজ সঙ্গীত উৎসবই অন্যতম। ফাউণ্ডেশন সেই পটভূমি নিয়েই মেলাকে উৎসব মুখর করার জন্যই শুধু লোকজ গানের উৎসবই নয়; আরো বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের গবেষণার প্রেক্ষিত থেকে প্রতি বছর নতুন নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে আয়োজন করে চলছে। সফলতার আলোর সুর্যও উকি দিয়ে উপরে উঠে একটু একটু করে। তাই মেলার প্রসারে যে লোকজ উৎসব কত প্রয়োজন, ফাউণ্ডেশনের মেলা পর্যবেক্ষণ করলে তা অনুধাবন করা যায়।

মেলার প্রসারে এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে তা নয়; নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যকে অর্থবহ করে তুলেছে।

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর গবেষণা প্রেক্ষিত।

বিশ্বনাথ সরকার
গবেষণা অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

"লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, '৯৬ এর গবেষণা প্রেক্ষিত" এর আলোচ্য বিষয়ে প্রথমেই গবেষণা বলতে আমরা কি বুঝি এবং গবেষণা কত প্রকার তা জানা প্রয়োজন বলে মনে করছি। গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায় গবেষণা হলো পুনঃ অনুসন্ধান (Re-search), অপেক্ষাকৃত উন্নততর পর্যবেক্ষণ, ভিন্ন প্রেক্ষিত খোঁজা এবং বাড়তি জ্ঞান সংযোজন করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন এবং সহজাত অনুসন্ধান প্রবণতাই এর মূল চালিকাশক্তি যার চূড়ান্ত লক্ষ্য সর্বাধিক মানব কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা। বলা হয়ে থাকে যে সম্পূর্ণ অজানাকে জানা নয়, বরঞ্চ যা সম্পর্কে অল্প বা অস্পষ্ট ধারণা আছে প্রয়োজনের খাতিরে তাকে গভীরভাবে জানা ও স্পষ্টতর করার মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করাকেই আমরা বুঝি গবেষণা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন "জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান", তেমনি গবেষক বা বিজ্ঞানীও প্রচলিত বা উপস্থিত জ্ঞানের মাধ্যমে অজানা অংশটুকু খুঁজে দেখার চেষ্টা চালিয়ে যান। Marry E Macdonald (Polansky. 1960-24) "Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and variable" (সুশৃঙ্খল অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে বোধগম্য ও যাচাইযোগ্য জ্ঞান সংযোজন প্রক্রিয়াই হলো গবেষণা)। D. Slesinger এবং Stephenson (Encyclopaedia of Social Scienee, 1930 : 330)-এ উল্লেখ করেছেন যে গবেষণা হলো "The manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or varify knowledge, wheather that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art". (জ্ঞানবর্ধন, সংশোধন বা যাচাই পূর্বক সাধারণী করণের উদ্দেশ্যে বস্তু প্রত্যয় বা প্রতীক নিয়ে কাজ করা, যাতে করে সেই জ্ঞান কোন তত্ত্ব সৃষ্টি অথবা কোন কৌশল অনুশীলনে সহায়তা করতে পারে)। গবেষণার নামে যে সমস্ত উপাদান নিয়ে জ্ঞান অনুসন্ধান করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

(১) অনুসন্ধিৎসু ও কৌতুহলী মনোবৃত্তি
(২) সুনির্দিষ্ট বিচরণ ক্ষেত্র
(৩) সুবিন্যস্ত অনুমান (অনুকল্প)

লোকজ মেলা'৯৬এর সেমিনারের একটি দৃশ্য

মেলার স্টলে বেচা-কেনার একটি দৃশ্য

(৪) পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যের সহজ লভ্যতা

(৫) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কৌশল এবং

(৬) ফলাফল উপস্থাপনের যৌক্তিক কৌশল।

উদ্দেশ্যগতভাবে যে কোন গবেষণাই নতুন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপস্থিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে তথ্য ও তত্ত্ব গঠনে আগ্রহী। এর পেছনে অবশ্য কাজ করে গবেষকের অনুসন্ধিৎসু বা কৌতুহলী মন এবং সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ উদ্ভাবন প্রত্যাশা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে গবেষণা লব্ধ ফলাফল বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকে সামনে রেখে বিজ্ঞানীগণ গবেষণাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন যথা - ক) মৌলিক গবেষণা (Basic Research) এবং খ) ফলিত গবেষণা (Applied Research)। এ ছাড়াও বর্তমান কালে বিজ্ঞানীগণ আরও এক ধরণের গবেষণার কথা উল্লেখ করে থাকেন তা হচ্ছে গ) কার্যক্রম গবেষণা (Action Research)।

ক) মৌলিক গবেষণা (Basic Research) ঃ মৌলিক গবেষণাকে অনেক সময় Basic Research কিংবা Fundamental Research ইত্যাদি নামেও উল্লেখ করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বের বিভিন্ন মৌলিক নীতি ও সত্য আবিষ্কার করা। এ নীতিতে মৌলিক গবেষণা সুদৃঢ়ভাবে কেবল তত্ত্বের পরীক্ষা ও উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে মাত্র, এর তাৎক্ষণিক কোন ব্যবহার প্রত্যাশা থাকে না। পরবর্তীতে অথবা পরোক্ষভাবে এর ব্যবহার হতে পারে। এ বিষয়ে মৌলিক গবেষণার কোন প্রকার উদ্দেশ্য বা প্রবণতা থাকে না। এ সমস্ত কারণে মৌলিক গবেষণায় গবেষক প্রাপ্ত তত্ত্বের ব্যবহার উপযোগিতার পরিবর্তে এর নিয়ন্ত্রণ ও যথার্থতার প্রতি কেবল গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এসব গবেষণা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেই হয়ে থাকে। পাশাপাশি আচরণগত ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্যে বিজ্ঞানী মানুষের পরিবর্তে প্রাণীদের ব্যবহার করে থাকেন, যাতে করে এখানে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয়। মৌলিক গবেষণার সংজ্ঞায় Kenneth D. Bailey (1982 : 21) বলেন "Pure research (Sometimes called basic research) involves developing and testing theories and hypothesis that are intellectually interesting to the investigator and might those have some social application in the future but no application to social problems in the present time"

বিশুদ্ধ গবেষণা (যাকে কখনও মৌলিক গবেষণা বলা হয়) তত্ত্ব ও অনুকল্পের বিকাশ এবং পরীক্ষা ঘটিয়ে থাকে যা অনুসন্ধানকারীর নিকট বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে আগ্রহ উদ্দীপক এবং যার ভবিষ্যৎ সামাজিক কার্যকারিতা থাকলেও বর্তমানে সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে কোন কার্যকারিতা থাকে না।

খ) ফলিত গবেষণা (Applied Research) ঃ ফলিত গবেষণাকে মাঠ গবেষণা ও (Field Research) বলা যেতে পারে। এ গবেষণার মূল লক্ষ্যই হলো প্রাপ্ত তথ্যকে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োগ করা। মৌলিক গবেষণার মত এখানে নিয়ন্ত্রণ যথার্থতার প্রতি কমগুরুত্ব দিয়ে বরঞ্চ প্রায়োগিক দিকেই বেশী জোর দেয়া হয়। বস্তুতঃ বাস্তব সমস্যা সমাধান, উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্যক সহায়তা ফলিত গবেষণার প্রত্যাশা। একটি উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্যা, চাহিদা, সম্পদ, প্রক্রিয়া ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা এবং কার্যকারণ সম্পর্কে যাচাই করা হয়ে থাকে ফলিত গবেষণার মাধ্যমে। এর সংজ্ঞায় Kenneth D. Dailey (1982-21) বলেন, Applied Research is research with findings that can be applied to solve social problems of immediate concern. (কোন সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রায়োগিক হতে পারে এমন ফলাফল সমৃদ্ধ যে গবেষণা তা হলো ফলিত গবেষণা)। এ ধরণের গবেষণায় গবেষকের মূল উদ্দেশ্য হলো তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য ও লাগসই সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করা। মৌলিক গবেষণার মত এখানে জ্ঞানের আহরণ নয়, বরঞ্চ সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের প্রয়োগই চূড়ান্ত বিবেচ্য বিষয়।

গ) কার্যক্রম গবেষণা (Action Research) ঃ ফলিত গবেষণার মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুততার সংগে যে সমস্ত গবেষণা করা হয় তাকেই মূলতঃ কার্যক্রম গবেষণা বলে আখ্যায়িত করা যায়। এর সংজ্ঞায় এস ওয়ালীউল্লাহ (NIPORT 1984 : 7) উল্লেখ করেছেন "Action Research intails the modification of existing systems and assessing the cost effectiveness of the modification"

(অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন কর্মসূচীর কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও তা সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দিক নির্দেশ করা গবেষণার অন্যতম একটি কাজ)। সংগত কারণে সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয়াদি তুলে ধরা হয়। ফলিত গবেষণার সংগে কার্যক্রম গবেষণার পার্থক্য হলো ঃ কার্যক্রম গবেষণায় বাস্তবতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এখানে সাধারণের পরিবর্তে কর্মসূচীর বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

গবেষণার সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ পর্যালোচনা করলে লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, গবেষণা প্রেক্ষিত এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে আয়োজিত "লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ৯৬" আয়োজনের ধারাবাহিকতা অনেকটা গবেষণামূলক বলা যায়। এই মেলা ও উৎসবের মৌলিক উপাদান লোক সংগীত, লোক কারুশিল্প মেলা এবং লোকজ উৎসব। সর্বস্তরের দেশী-বিদেশী সকল মানুষের এক মিলন ক্ষেত্র হিসেবে এই মেলা ও উৎসব রূপান্তরের ধারায় অগ্রগতি এবং জনপ্রিয়তা বেড়ে চলছে নিঃসন্দেহে। পুরোপুরি গবেষণার আঙ্গিকে এই মেলা ও উৎসবকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনে গবেষণার সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদের সাথে পর্যালোচনা করলে প্রতিটি কার্যক্রম চমকপ্রদ, চিত্তাকর্ষক এবং গবেষণামূলক। তবে

শোলার তৈরী পাখি

একথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোকজ সংস্কৃতির উন্নয়নের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান ফাউণ্ডেশনে নতুন যাদুঘর কনসেপ্ট, লোকশিল্পগ্রাম পরিকল্পনা; মেলার সমাহার এবং তৎভিত্তিক সেমিনার আয়োজন সবই গবেষণা কেন্দ্রিক।

বিশ্বনন্দিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১২ই মার্চ ১৯৭৫ সালে সরকারের এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন এবং গ্রামীণ বর্তমান কারুশিল্পকে উৎসাহ ও বাঁচানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ায় ফাউন্ডেশনের আত্মপ্রকাশ গবেষণার উপর ভিত্তি করেই। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সম্পর্কে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বলেন "আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের গৌরবময় পরিচয় হারিয়ে ফেলছি। দেশী-জিনিসের কদর আমরা ভুলে যেতে বসেছি। সত্য সুন্দর মনের অভাবে বাংলাদেশে চলেছে রুচির দূর্ভিক্ষ। শতকরা কুড়ি ভাগ লোকের মতামত এবং উপলব্ধিকে ভয়ে অথবা ভয় পাওয়ার আনন্দে গ্রহণ করেছে শতকরা আশি ভাগ লোক। বহু দেশ ঘুরেও আমি বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য ও এদেশের মত অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোথাও দেখতে পাইনি অথচ এই সুন্দরের উপলব্ধি আজ অনেকেরই কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা শিল্পীর জাতি। বিদেশীরা লুটে নিয়ে গেছে আমাদের অতীতের স্মৃতি বারবার, আজও নিয়ে যাচ্ছে। নবাবগঞ্জের কাঁথায় যে প্রতীক ধর্মী নকশা, মাছ, পাখি, হাতী, ফুল ও লতাপাতার সমাবেশ রয়েছে, ফ্রান্সের মিউজিয়ামে তা নিয়ে গবেষণা হয়। দেশের লোক হয়ে আমরা যা চিনি না বা জানি না। বিদেশে গিয়ে এদেশ থেকে প্রাপ্ত সে সব সামগ্রী সযত্নে সংগ্রহ দেখেছি বিভিন্ন যাদুঘরে। অনেক দেরী হয়ে গেছে এমনিতেই। আজ এখনি পদক্ষেপ নিতে হবে সবাইকে। সরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁচাতে হবে আমাদের লোকশিল্পের নিপুণ কারিগরদের"।

শিল্পাচার্যের স্বপ্নের সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন"। শিল্পাচার্যের নিজের লেখা থেকে স্বপ্নের সোনারগাঁ সম্পর্কে জানা যায় "বাংলার মানুষ গ্রাম ভিত্তিক, বাংলার মূল সংস্কৃতি গ্রামকেন্দ্রিক, বাংলার সমাজ ঐশ্বর্য গ্রামের কৃষাণ, কুটির শিল্পী, ইদানিং বহু-নগর কেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে সত্য কিন্তু বাংলার মুখের আদল পাওয়া যায় কুটির শিল্পেই। বাংলার মসলিন, জামদানী, অলংকার, কারুকার্য এমন কি সাধারণ আসবাবপত্রেও বাঙ্গালীর শিল্পী মনের পরিচয়। শুধু শিল্পগুলো মহান তাই নয় একদা এইসব কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক মূল্য

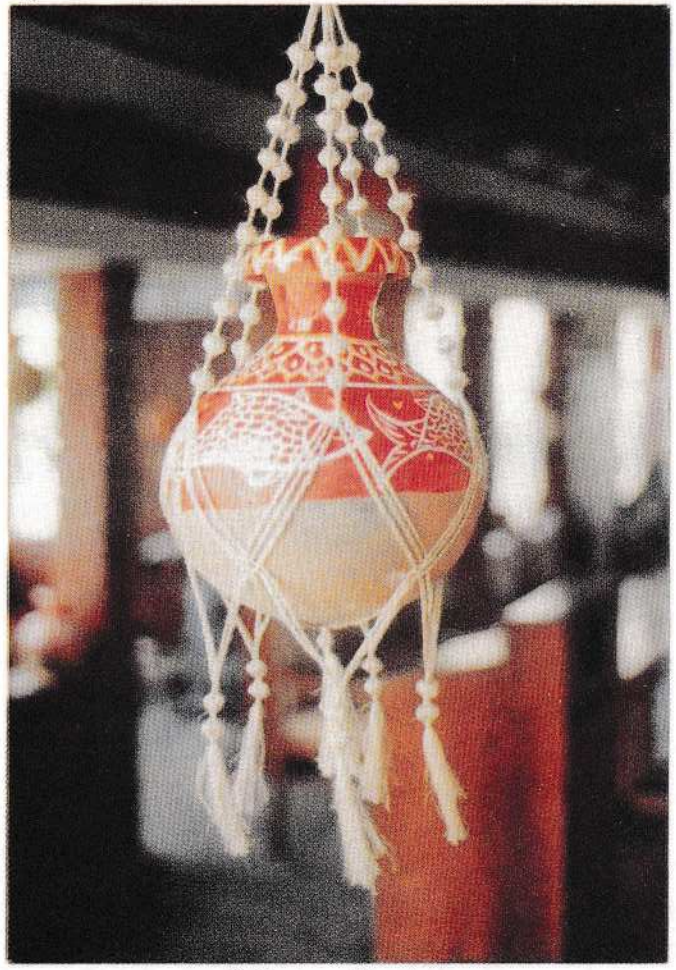

নক্‌শি শিকায় নক্‌শী করা কলস

ছিল প্রচুর। ক্ষয়িষ্ণু হলেও এখনও এদের আর্থিক মূল্য রয়েছে। শৈল্পিক কারণে সৌন্দর্যবোধের প্রয়োজনে এবং গ্রাম বাংলার অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের কামনায় এদেশের লোকজ শিল্পগ্রাম (Folk Art Industrial Village) স্থাপনের প্রয়োজন প্রচন্ড। একটি সুন্দর শিল্পগ্রাম সুকুমার শিল্পকে, গ্রামীণ শিল্পকে পালন করবে, শাশ্বত সৌন্দর্য বোধকে এযুগে সবার সামনে তুলে ধরতে পারবে। দেশ বিদেশ থেকে পর্যটকরা এইসব গ্রাম দেখতে পারবে। পর্যটককে আকর্ষণ করা ছাড়া তৈরী জিনিস বিক্রি করেও দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া ধ্বংস প্রাপ্ত বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের রয়েছে। বাংলার লোকশিল্পকলার ঐতিহ্য যেমন মহান তেমনি বিভিন্ন মুখী এবং নিঃসন্দেহে গৌরবের।

আমাদের আকাঙ্খা এমন একটি গ্রাম স্থাপন করার যা শিল্পগ্রাম, সোনার গ্রাম হিসেবে আরো শত শত গ্রামের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। এইটি যেমন সব রকম কুটিরশিল্পের প্রাণকেন্দ্র হবে, তেমনি লোকজ শিল্পকে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে প্রয়োজনীয় প্রেরণা জোগাতে এই গ্রাম সাহায্য করবে। এই গ্রামকেই "সোনারগাঁ বলব" (আবদুল মতিন -জয়নুল আবেদিন পৃঃ ৭৩ -৭৪)। লোক ও কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কারুপল্লীতে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে হস্ত ও কুটির শিল্পের এক শৈল্পিক পরিবেশ, গবেষণা ধর্মী কারুশিল্প গ্রাম। এখানে শিল্পীগণ তৈরী করছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রী, ফাউন্ডেশন চত্বরে আগত দেশী বিদেশী পর্যটকগণ তৈরীর কৌশল একদিকে দেখতে পাচ্ছেন এবং পছন্দমত হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রী ক্রয় করছেন। ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হিসাবে গবেষণার মাধ্যমে এই কারুপল্লীর শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের সমগ্র কর্মসূচীটি বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির প্রধান উপাদান পল্লীজীবন ভিত্তিক লৌকিক আচার-আচরণ, উৎসব ও লোকজ শিল্পকলা নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই লোক সমাজ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক এবং জাতীয়তাবাদের ধারকও বটে। লোক সমাজের জীবন ধারণ রীতি থেকে শুরু করে শষ্য ফলনের রীতি, পানাহার, খেলাধূলা, লৌকিক উৎসব, সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য, চিত্রকলা-ভাস্কর্য্য, কারুশিল্প, পোষাক-পরিচ্ছদ-অলংকার, মাটির হাড়িপাতিল, পোড়া মাটির ফলক, পুতুল, নকশী কাঁথা, পট, পাটি, দেওয়াল চিত্র, পাটের শিকা,শোলার কাজ, পিতল তামা কাসার কাজ, লোকজ বাদ্যযন্ত্র, লোকজ, সংগীত, লোক কারুশিল্প এবং লোকজ উৎসব ইত্যাদি চারুও কারুশিল্প যা আমাদের লোকজ সংস্কৃতিক সম্পদ এবং প্রতিটি প্রেক্ষাপটই গবেষণা ধর্মী।

অন্যান্য বছরের তুলনায় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এবারের লোকও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ ব্যতিক্রম ধর্মী গবেষণামূলক মেলা ও উৎসব নিঃসন্দেহে তা বলা যেতে পারে। লোক মেলা সম্পর্কে সৈয়দ মাহবুব আলমের লেখা থেকে জানা যায় "স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীজীবন ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় মানুষকে পরিতৃপ্ত করার ঐতিহ্য এদেশের লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের গ্রাম ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে লোকজ পরিবেশ। লোকজ পরিবেশে গ্রামীণ মানুষের জীবন যাপনের অনুষঙ্গই সকল আচার-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ, কৃষি কাজ ও জীবনের নানা খুঁটিনাটি অনুভব ও চেতনার আলোকে একান্তই এদেশের বৈশিষ্ট্যের লোক সংস্কৃতি বলে রূপ পরিগ্রহ করেছে। লোক সংস্কৃতির পরিচয়কে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসীমায়, ব্যাপকতায় এদেশের ঐতিহ্যের লোক সমাজের গ্রামীণ মানুষ তার প্রতিদিনের জীবন যাপনে, কর্মকান্ডে চার পাশের প্রকৃতির উপাদান ও উপকরণ দিয়ে বৈচিত্র্যের, বৈশিষ্ট্যের রূপ ও গড়ণ, বস্তুর সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে, অনিবার্য করে তুলেছে। বাংলার লোক কারুশিল্পের সৃষ্টি উপযোগিতার নিরিখে উদ্ভাবন, রূপ পরিগ্রহ করলেও আবহমান বাংলার মানুষের অনুভব ও চেতনার গুণ যুক্ত হয়ে অলংকৃত বর্ণাঢ্য রূপময় সৃষ্টিতে পরিণত হয়। ফলে একটি বৈশিষ্ট্যের লোক ও কারুশিল্প হিসেবে রূপ লাভ-করেছে। পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে লোকজীবনে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান, চলার পথে মেলা এবং সামগ্রিক উন্নয়নকে অবলোকন করার আনুষ্ঠানিক আয়োজন হচ্ছে লোক মেলা। লোক সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান লোক কারুশিল্পের আদান প্রদানের ক্ষেত্র লোক মেলা। লোক সংস্কৃতির উজ্জীবনের স্থান লোক মেলা। ("সৈয়দ মাহবুব আলম-লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৫ প্রসংঙ্গ দূর্লভ কিছু প্রদর্শনী" পৃষ্ঠা - ২০)

লোকও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-'৯৬ রূপান্তরের ধারায় বর্তমানে দেশী-বিদেশী দর্শক, পর্যটক, দর্শনার্থী এবং সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সংগে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মেলা ও উৎসবের শিল্প সংস্কৃতি এবং জীবনাচারের উপযোগিতা সুস্পষ্টভাবে আমাদের জীবন প্রবাহে যুক্ত হয়ে আছে। আমাদের আজকের সমাজের জন্য সুস্থ ও বলিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে লোক সমাজের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবয়বের নির্ভুল চিত্র পাওয়া যায় এবারের মেলা ও উৎসবে। সর্বোপরি এ বছরের মেলা ও উৎসবে রয়েছে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অস্তিত্বের সংগ্রাম ও নান্দনিক চিন্তা-চেতনায় অনিবার্য গবেষণাধর্মী সেমিনার, লোকজ খেলা, লোকজ সংগীত, লোকজ মঞ্চ, জীবন্ত প্রদর্শনী, কারুশিল্প মেলা ও উৎসব, এবং দর্শক শ্রোতা প্রভৃতির সমন্বয়ে মেলা ও উৎসবের পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণাধর্মী প্রেক্ষিত। যেমন ঃ

১। সেমিনার ঃ সেমিনার হচ্ছে গবেষণার বাস্তব দলিল। সেমিনারের মাধ্যমেই গবেষকের মূল বক্তব্য বিজ্ঞ আলোচকগণের সুচিন্তিত আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। গবেষণার বিষয়বস্তুকে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন আলোচকগণ। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণাধর্মী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এবারের মেলা ও লোকজ উৎসবে, ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনে এবং গ্রামীণ বর্তমান

কারুশিল্পকে উৎসাহ ও বাঁচানোর প্রয়োজনে এবারের সবকয়টি সেমিনারের বিষয়বস্তু গবেষণাধর্মী, গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। যথা (১) বাংলাদেশের লোকজ খেলার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা,(২) জামদানীর অতীত, বর্তমান ও রুপান্তরের ধারা, (৩) মৃৎশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা, (৪) নকশী কাঁথার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা, (৫) পাটজাত কারুশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা (৬) লোক ঐতিহ্যের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা। প্রবন্ধকারগণ যথাক্রমে ১। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ২। মুনিরা ইমদাদ ৩। ডঃ রফিকুল আলম ৪। সৈয়দ মাহবুব আলম ৫। বিশ্বনাথ সরকার ৬। ডঃ ওয়াকিল আহম্মদ। প্রতিটি বিষয়বস্তু ছিল প্রতিষ্ঠানের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। গবেষক এবং আলোচকগণও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ। সেমিনারের প্রতিটি বিষয়বস্তুকে আরো সুন্দর ও বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তোলার জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়া গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেন, উক্ত পর্যালোচনায় সেমিনারে আগত বিজ্ঞ আলোচক, উপস্থিত বিদগ্ধজন এবং সুধীবৃন্দ পরিচালক মহোদয়ের মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করেন। সার্বিকভাবে প্রতিটি সেমিনারের সফল উপস্থাপন সর্বজন কর্তৃক সমাদৃত হয়। ভবিষ্যতে এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার গবেষণার এক উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষিত হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়।

২। **লোকজ খেলা ঃ** লোকজ খেলা অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের লোক সমাজে প্রচলিত ছিল। ধারণা করা হয় প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে লোকজ খেলার প্রচলন হয় আমাদের এই ভূখন্ডেই। ফাউন্ডেশন গত ২/৩ বৎসর যাবৎ লোকজ মেলা ও উৎসবে, লোকজ খেলাধূলা তুলে ধরার কর্মসূচী হাতে নেয়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের লোকজ খেলাসমূহ অধিকতর গবেষণাধর্মী নিঃসন্দেহে বলা যায়। আধুনিক খেলাধূলার জনপ্রিয়তার মাঝেও আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকজখেলা দাড়িয়াবান্ধা, কানামাছি, কাবাডি খেলা প্রভৃতি আজও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং টিকে আছে। ফাউন্ডেশন বিলম্বে হলেও লোকজ খেলাধূলাকে টিকিয়ে রাখার যে গবেষণা ধর্মী প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে, ভবিষ্যতে লোকজ খেলার শ্রীবৃদ্ধি এখান থেকে হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী লোকজখেলার আঞ্চলিক নাম, নিয়মকানুন প্রভৃতি মাঠ পর্যায়ে জরিপ করে সংরক্ষণ করার বিষয়ে ফাউন্ডেশন গবেষণাধর্মী লোকজ খেলাধূলা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে প্রতি বছর অন্ততঃ ১০ টি গ্রামীণ লোকজ খেলার ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে অতীত দিনের লোকজ খেলার ইতিহাস। এর থেকে আগামী প্রজন্ম হারিয়ে যাওয়া লোকজ খেলাধূলা সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং তার চর্চা করবে। আলোকচিত্রের মাধ্যমে সচিত্র বিবরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন এ গবেষণা ধর্মী কাজটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে গত কয়েক বছর যাবৎ, যা বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে নতুন প্রয়াস। গবেষণার মাধ্যমে সারাদেশে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাহসিক পদক্ষেপ।

৩। **লোকজ সংগীতানুষ্ঠান ঃ** লোকজ গান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উৎসবে লোক সংগীতের আয়োজন হয়ে আসছে। এবারের লোক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন অনেকটা গবেষণাধর্মী, প্রতিটি লোকজ শিল্পীকেই দেখা গেছে সেই অতীত দিনের ঢংয়ে লোকজ গান পরিবেশন করতে। লালন, বাউল, মাইজভান্ডারীসহ প্রভৃতি কত শত শত লোকজ গান রয়েছে যার পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় না। তবে প্রচলিত লোকজ গান আজও আধুনিক যুগে টিকে আছে। ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবারের মত এবারও গবেষণাধর্মী ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংগীত, লোকনাট্য প্রভৃতি তুলে ধরা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় দেওয়ানী মদিনার কিচ্ছা। এটা মর্ডাণ ফর্ম এবং প্রাচীন ফর্ম দুই ফর্মেই প্রদর্শিত হয়। ভবিষ্যতে এ ধারাবাহিকতায় আমাদের অতীত দিনের বিভিন্ন লোকজ সংগীতের রূপান্তরের ধারাকে ফাউন্ডেশন গবেষণার মাধ্যমে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করতে যে কর্মসূচী নিয়েছে তাতে হারিয়ে যাওয়া লোকজ সংগীত পুনরুজ্জীবিত হবে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন লোক সংগীতের সংরক্ষণ ও গবেষণা যা ফাউণ্ডেশন মেলার মাধ্যমে করে যাচ্ছে।

৪। **লোকজ মঞ্চ ঃ** লোকজ অনুষ্ঠান উপযোগী বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব বজলুর রহমান ভূঁইয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে যে লোকজ মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে, যা এখানকারই একজন প্রবীণ কারিগর তার শিল্পকর্মটি করেছেন তাও গবেষণা ধর্মী। চৌচালা বিশিষ্ট বারান্দা সংলগ্ন পুরানা দিনের আড় চালার মত সম্পূর্ণ বাঁশ ও ছন দ্বারা নির্মিত অদ্ভূত সুন্দর মঞ্চের সৃষ্টি করা হয়। এটি রুচিশীল ও সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের এক বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মেলার এই লোকজ মঞ্চের তৈরীর কৌশল ও উপকরণ বিষয় মূল কারিগরের নিকট থেকে সমস্ত বিবরণ নথিভূক্ত করে রাখা একান্ত অপরিহার্য। এই মঞ্চ ছিল মেলায় আগত সকল স্তরের দর্শক শ্রোতাদের নিকট অসম্ভব আকর্ষণীয় বিরল এক লোকজ মঞ্চ। এছাড়াও প্রতিবারের মেলাতে লোক মঞ্চের গড়নের ধরণ গ্রাম বাংলার আদি রূপ নিয়ে তৈরী হচ্ছে, যা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রেক্ষিতের আঙ্গিকে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব।

৫। **জীবন্ত প্রদর্শনী ঃ** লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ স্থানীয় স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীগণ এক ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণামূলক জীবন্ত প্রদর্শনী উপস্থাপন করে। আমাদের লোক সমাজে বর্তমানেও এ ধরণের বাস্তবধর্মী ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রম, এখনও জনপ্রিয়। বাস্তব সামাজিক রীতি হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বিয়ে পড়ানো অনুষ্ঠান, গ্রামীণ বিচার, রাখালের বাঁশী বাজানো, মুড়ি ও খৈ ভাজা, আলতা পড়ানো প্রভৃতি। আধুনিক ফ্যাশন জগতেই আমাদের আদি লোক সমাজের সামাজিক নিয়ম নীতি অতীতের মত বর্তমানে সমাজে প্রচলিত এই রীতি নীতি অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ অতীত দিনের নিয়ম নীতি গবেষণা করে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের রূপান্তরের ধারা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ফাউন্ডেশন প্রতিবছর লোকজ উৎসবে এ ধরণের জীবন্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আমাদের হারিয়ে যাওয়া লোকজ

ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করে চলছে। সেটা শুধু আকর্ষণীয় নয়, বরং উপভোগ্যও বটে। জীবন্ত প্রদর্শনী ভিডিও, অডিও করে ধরে রাখা হয়েছে, তা গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ফাউন্ডেশন করতে পারে।

৬। কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ ঃ বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে প্রতিবারের মত এবারও ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ইং থেকে ২৩ শে মার্চ ৯৬ ইং পর্যন্ত কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব,৯৬ বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন এবং রূপান্তরের ধারায় গবেষণা ধর্মী মেলা ও উৎসব নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় বলা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরীর প্রধান প্রধান এলাকাসহ সমগ্র অঞ্চল ছিল পোষ্টার এবং ফেষ্টুনে ভরপুর। উৎসব ও মেলায় সমাগত কারুশিল্পীগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়ে দোকান সাজিয়েছে, লোকজ শিল্পীগণ লোকজ গানে ভরে রেখেছে সন্ধ্যা। যতক্ষণ না লোকজ গান শেষ হয় ততক্ষণ সুরে সুরে সমস্ত অনুষ্ঠান ছিল আনন্দময়, এক লোকজ সংগীত মুখর পরিবেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে সমাপনী অনুষ্ঠান সবই লোকজ আঙ্গিকে সাজানো গবেষণা ধর্মী, উপভোগ্য এবং আনন্দময়। এর ধারাবাহিক জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখার জন্য গবেষণা করতে হবে এবং আরও আকর্ষণীয় কর্মসূচী তুলে ধরতে হবে। এবারের লোকজ উৎসবকে টেলিভিশন, রেডিও সহ বিভিন্ন জাতীয় প্রচার মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করে দেশী-বিদেশীদের নিকট তুলে ধরেছে। গবেষণার সংজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত করে ভবিষ্যতে লোকজউৎসব ও মেলাকে সাজাতে পারলে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় হবে।

৭। দর্শক শ্রোতা ঃ বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৬ বাংলার লোকজ লীলাভূমি আবহমান গ্রামবাংলার অতীত লোকজ সংস্কৃতির সনাতন জীবন জনগণের জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এবার মেলায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমাগম ঘটেছে। সমাগত দর্শক শ্রোতাদেরকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে গবেষণা প্রেক্ষিত। বিশেষ করে এক নিরীক্ষায় দেখা যায় অন্যবার থেকে এবার প্রতিদিন মেলা ও উৎসব দেখার জন্য অনেক বেশী দর্শক পর্যটক দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছে। মেলা ও উৎসবে আগত দর্শকের সাথে আলাপ আলোচনা কালে প্রধানতঃ চার শ্রেণীর দর্শক সমাগম হয়েছে ধরে নেয়া যেতে পারে, যথা -

৭.১ কারুশিল্প মেলায় দর্শক ঃ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে আয়োজিত লোকজ মেলা ও উৎসবের নির্ধারিত এলাকায় লোকজ মেলার আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। এখানে যারা আসেন তাদের মধ্যে প্রতিদিন লোকজ মেলায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবার পরিজন যেমন ছোট ভাই বোনসহ মা-বাবা, আবার বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এরা সাধারণত মেলা দেখার সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করেন। তারপর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে বাড়ী ফেরার পালা। এধরণের দর্শক শ্রোতাকে প্রশ্ন করে জানা গেছে মেলা দেখার সাথে তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় এবং লোকজ মেলা উপভোগ করতে এসেছেন।

৭.২ লোকজ সংস্কৃতি উৎসবে দর্শক ঃ এই শ্রেণীর দর্শকদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ সন্ধ্যার আগে আসতে শুরু করে এবং নির্ধারিত অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অনুষ্ঠান শুরু হলে উপভোগ করেন এবং ভাল মন্দ হলে মন্তব্যও করে থাকেন। কাউকে নিশ্চুপ থেকে গান শুনতে দেখা যায়, কাউকে বা হাততালি দিতে দেখা যায়, আবার কাউকে লোকজ গানে সন্তুষ্ট হয়ে ১০/২০ টাকা পুরস্কার দিতেও দেখা যায়। স্থানীয় ও আশে পাশের লোকজন এখানে বেশী, তবে অনেক দূরের লোকজন ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে ফাউণ্ডেশনের আশেপাশে বেড়াতে এসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা গেছে। এদেরকে প্রশ্ন করলে জানা যায় অনুষ্ঠান উপভোগ্য, তবে শিল্পীদের আরও মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

৭.৩ উঠতি তরুণ তরুণী দর্শক ঃ এরা সকলেই ১২-২০ বৎসরের বয়সী। এদের রোমান্টিক মন মানসিকতার কারণে এদের মেলা ও উৎসবের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরা মুক্ত আকাশের নীচে ঘুরতে এবং কথা বলতে বলতে কিছু খেতে পছন্দ করে। মেলা বা উৎসবে দীর্ঘক্ষণ ধৈয্যচ্যুতি হয়, তাই এরা কোথাও বেশীক্ষণ স্থির থাকতে চায় না। হৈহুল্লুর করে জমজমাট আসরের সৃষ্টি করাই এদের ধর্ম, এরা স্কুল, কলেজের ছাত্র/ছাত্রী বেশীর ভাগ। এছাড়াও স্থানীয় মধ্যবয়সী লোকজন ছিল। এদেরকে প্রশ্ন করলে জানা যায় সন্ধার পর আলোক সজ্জার ঝলকানীতে তাদের মন লোকজ সংস্কৃতির পরিমন্ডলে উদাসীন হয় এবং অত্যন্ত আনন্দে নিজেরাও গান গায়। সার্বিক অনুষ্ঠানের সমালোচনা করতে করতে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে দেখা যায়।

৭.৪ ভাসমান দর্শক ঃ এবারের মেলা ও উৎসবে ভাসমান দর্শকের আগমন ছিল অনেক বেশী, এরা আশে পাশে বেড়াতে এসেছে এবং মেলা ও উৎসব দেখে কিছুক্ষণ আনন্দের সাথে উপভোগ করে। এরা সকল বয়সের এবং সমবয়সীগণ আড্ডায় মগ্ন থাকে। এই ধরণের দর্শকদেরও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী পণ্যাদি মেলা থেকে ক্রয় করতে দেখা গেছে। অন্যদিকে লোকজ সংস্কৃতি অনুষ্ঠানও উপভোগ করতে দেখা গেছে। এদেরকে প্রশ্ন করলে জানা যায় তারা সবকিছু একটু একটু করে উপভোগ করতে ভালবাসে, তবে তাদের প্রধান কাজ সমবয়সী মিলে আড্ডা দেয়া, গল্পগুজব নিয়ে ব্যস্ত থাকা প্রভৃতি।

অতীতে আমাদের কারুশিল্প মেলা বা উৎসব নিয়ে কোন প্রকার গবেষণা করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবারের মেলা গবেষণা ধর্মী হিসেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গবেষণা করে লোকজ সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরী করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের লোক ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা যাবে। ব্যাপক ভাবে লোকজ মেলা ও উৎসবকে উৎসাহিত করে এর প্রসার করার প্রয়োজনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। লোকজ মেলা ও উৎসবে আগত দর্শক শ্রোতাদের উপর জরিপ কাজ চালালে

গবেষণাধর্মী প্রেক্ষাপট তৈরী হবে এবং ভবিষ্যতে মেলা ও উৎসবের আরও আকর্ষণ বাড়বে গবেষণার প্রেক্ষিতের মাধ্যমে।

পরিশেষে লোক কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এবারের লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব, ৯৬ এর সকল কর্মসূচী গবেষণার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করে অগ্রসর হতে হলে এবারের মেলা ও উৎসবের সকল কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিতে হবে। ফাউন্ডেশনের মেলা ও উৎসবের নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে লোককারুশিল্প ও লোকজ সংগীতের অতীত পরিচয়, হারিয়ে যাওয়া অতীতের ধারা, প্রাচীন ধারা, বর্তমান ধারা, মিশ্র ধারা, মেলা ও উৎসবে প্রদর্শিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, রূপান্তরের মাধ্যমে তুলে ধরে, লোক কারুশিল্প তথা লোকজ ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আমাদের নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি আজও বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে যেভাবে রূপান্তরের ধারায় টিকে আছে তা প্রত্যক্ষ করা যাবে গবেষণা মূলক মেলা ও উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে। ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনের মেলা ও উৎসব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার প্রয়োজনে লোককারুশিল্প ও লোকজ খেলা, মৃৎশিল্প, নকশী কাঁথা, পাটজাত কারুশিল্প ও লোক ঐতিহ্যের অতীত বর্তমান রূপান্তরের ধারার সেমিনার সমূহে লোক কারুশিল্পের গবেষণা প্রেক্ষিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এবারের লোক কারুশিল্প মেলা ও উৎসব গবেষণার মাধ্যমে লোক কারুশিল্পের, লোক সংগীতের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে সনাক্ত করা সহজ হবে। লোকজ মেলা ও উৎসবের সকল কর্মসূচীকে গবেষণার সমস্ত উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত করার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের প্রস্তাবনা, পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক সাফল্যেই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ লোকও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন অতি সম্প্রতি গবেষণা নীতিমালা প্রণয়নের অত্যন্ত কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছে এবং এই নীতিমালার আলোকে প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনায় সকল কর্মসূচী দ্রুত সফল বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ এর-গবেষণা প্রেক্ষিত পর্যালোচনার ফলাফলের উপর বাংলাদেশের বৃহত্তম মেলার রূপ নিয়ে আন্তর্জাতিক মেলার পর্যায়ে পৌছাবে।

বস্তু সংস্কৃতির দলিলীকরণ ঃ প্রেক্ষিত লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬

সৈয়দ মাহবুব আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ

প্রত্যেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান, টিকে থাকে, বিকশিত হয়। এ জন্য সাংস্কৃতিক অবস্থা-সংস্কৃতির উপর প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রভাব প্রয়োগ করে থাকে। প্রভাব প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে তার বসবাসের, জীবনযাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। অর্থাৎ মানুষকে সর্বত্র তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানকে ব্যবহার, কাজে লাগিয়ে একটি অপ্রধান, গৌণ পরিবেশ সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়।[১] (M. Keesing 1965; 197) মুখ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় মানুষ একটি গৌণ পরিবেশ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এভাবেই সাংস্কৃতিক অবস্থা, পরিবেশ নির্মিত হয়। মানুষের তৈরী গৌণ পরিবেশকেন্দ্রিক প্রাথমিক জীবন ধারা, সাংস্কৃতিক অবস্থার রূপটি আজকের গ্রামীণ লোকজীবনধারা-লোক সাংস্কৃতিক অবস্থায় আজ অবধি ক্রমপুঞ্জিত ধারায় ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বস্তুসংস্কৃতি

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান ও কাঁচামালকে ব্যবহার ও কাজে লাগিয়ে যে গৌণ পরিবেশ, জীবনধারা, সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মিত হয় তার দৃশ্যতঃ বাহ্যিক রূপকে প্রত্যক্ষ করি বস্তু সংস্কৃতির নানা বস্তুতে, জিনিসে। মূলতঃ মানুষের তৈরী বস্তুর সংগে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানুষের স্বভাব, আচরণের এবং জীবনধারার-সংস্কৃতির সংযুক্তিসাধনের বিশেষ গুণ, বৈশিষ্ট্য বস্তুসংস্কৃতিতে, বস্তুসংস্কৃতির বস্তুতে বিদ্যমান, সক্রিয়। প্রকৃতির কাঁচামাল, উপকরণ দিয়ে দক্ষ, নিপুণ হাতের পরিচালনায় ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত কৌশল প্রয়োগ করে বস্তু তৈরী করা হয়। প্রতিটি বস্তু তৈরীর উপকরণের মৌলিক গুণ, বৈশিষ্ট্যসহ এর প্রকৃত বাস্তব আকার, গড়ণ রয়েছে। এবং বিভিন্ন ধরণের, শ্রেণীর বস্তুর

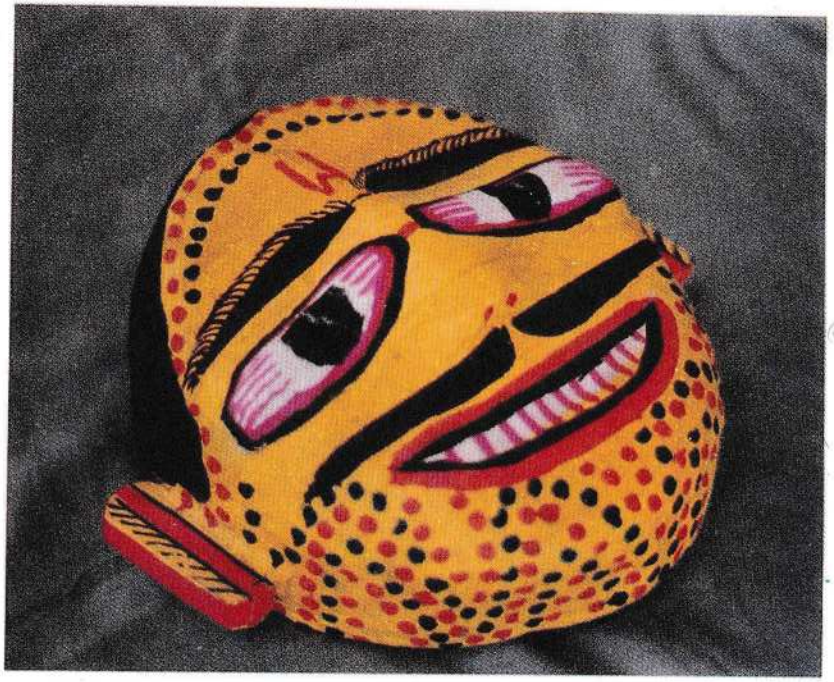

শোলার তৈরী মুখোশ

দইয়ের হাড়ি

সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক উপকরণের গুণ, বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল। এবং প্রাকৃতিক উপকরণের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বস্তুসৃষ্টিতে ঐতিহ্যিক লোকজীবনধারাকে কেন্দ্র করে প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতায় উৎকৃষ্ট, উপযোগী বলে লোক সমাজে সকলের গ্রহণযোগ্য, যথাযথভাবে স্থিরকৃত, নির্ধারিত গড়ণ সম্বলিত নমুনাসমূহকে অনুসরণ করা হয়। যেমন লাঙ্গল, দা. কাস্তে, চাকা, ঝুড়ি, পাটি, মাথাল, নৌকা, মৃৎপাত্র, মাটির ও বাঁশের ঘর, বাঁশের বেড়া, হুক্কা, কাঠের চামচ ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত অধিকগুণ সম্পন্ন বস্তুর আকার, গড়ণে কারুশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপযোগিতার গুণ ছাড়াও সম্ভবতঃ নকশায় সূক্ষ্মতা, প্রতিসাম্যগুণ,গড়ণে পরিমার্জনার গুণ যুক্ত হয়। এবং বস্তু-কারুশিল্পের গড়ণের আকর্ষণীয় দিক ও এতে কায়িক পরিশ্রম, চেষ্টার প্রকাশ স্পষ্ট, দৃশ্যমান।

বস্তু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

একটি বস্তুর স্বাভাবিক ব্যবহারিক দিক, বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরো বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বস্তু বা কারুশিল্পের রয়েছে ব্যবহারিক দিক, তৈরীর উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা। যদি কোন নৃগোষ্ঠী কোন কারণে কালিক ব্যবধানে অদৃশ্য, হারিয়ে বা লুপ্ত হয়ে যায় তা হলে তাদের তৈরী বস্তু,কারুশিল্পের নিদর্শন আপাততঃ বাহ্যিক বস্তু হিসেবে, বস্তু সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু তাদের শারীরিক কর্মশক্তি, অনুভব, চেতনা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি স্বভাব-আচরণগত বৈশিষ্ট্য অপ্রচলিত, তামাদি হয়ে পড়বে। কেবল জাতিতত্ত্ব, এবং লোক ও লোকশিল্প যাদুঘরের গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ প্রদর্শন গ্যালারিতে যাদুঘর বিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতির নিরীখে ডিয়োরামা ও অন্যান্য প্রর্দশন পদ্ধতি এবং বিশেষ প্রর্দশনীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির স্বভাব-আচরণ, জীবনধারা কিভাবে বস্তুর-কারুশিল্পের নির্দশনে আরোপিত, স্থির, নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট তা দর্শকদের অবহিত করতে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন।

মুলতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে তার তৈরী গৌণ পরিবেশের জীবনধারায় খাদ্য, বস্তু, বাসস্থান, যোগাযোগ নিশ্চিত করতে যেসব জিনিস, বস্তু, ঐতিহ্যিক কৌশল ও দক্ষতায় তৈরী করার প্রয়োজন হয় তা বস্তু সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। এবং বস্তুসংস্কৃতির বস্তুই কারুশিল্প।

মানুষের "মানসিক অস্থির চিত্ত" অবস্থা, কৌতুহল,এবং বৈচিত্রের স্বাদ বস্তু, জিনিস-কারুশিল্প তৈরীতে আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়িয়ে আরো কিছু অতিরিক্ত-অনুভব মানুষকে তাড়িত করে। এ প্রসঙ্গে বস্তুসংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্পের নিদর্শনের গড়ণে ও সম্পূর্ণতার ব্যহ্যরূপ সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক লুই বলছেন যে, বস্তু,কারুশিল্প সরাসরি উপযোগিতার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু। অর্থাৎ বস্তু সংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পে উপযোগিতার গুণ, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আছে অসাধারণ বাড়তি মাত্রার প্রতিসাম্যতার গুণ, সুরুচিসম্পন্ন, সুন্দর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলের পরত।[২] (LOWIE, R, H: 1940) বস্তুসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্প মানুষের জীবনযাপনের উপযোগী গৌণ পরিবেশের অনুষঙ্গ। বস্তু, কারুশিল্পের বাহ্যিক রূপে ও গড়ণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ও মানুষের জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য যুগপৎ ক্রিয়াশীল। সেই সংগে যুক্ত হয়েছে মানুষের কৌশল ও দক্ষতার গুণ এবং সৌন্দর্য, ছন্দ ও নকশাগুণ। বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের আঞ্চলিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, নৃগোষ্ঠীর ভিন্নতা বিচিত্র ধরণের বৈশিষ্ট্যের বস্তু সংস্কৃতির উদভাবন ঘটিয়েছে। বস্তুসংস্কৃতি- বস্তু, কারুশিল্প যেহেতু মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় সৃষ্ট একটি গৌণ পরিবেশের (সাংস্কৃতিক) অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু বস্তু, কারুশিল্প মানুষের জীবন যাপনের, কাজকর্মকেন্দ্রিক। যেমন নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় এদেশের মানুষকে তার জীবনযাপনের গৌণ পরিবেশ সৃষ্টিতে অনিবার্যভাবে কৃষি কাজ, মাছ ধরা, মাটির হাঁড়ি,পাতিল তৈরী করা, নৌকা বানানো, তাঁতবোনার কাজকে বেছে নিতে হয়েছিল। এবং এসব কাজ করতে গিয়ে বৈশিষ্ট্যের বস্তু, কারুশিল্প-বস্তুসংস্কৃতির উদভব ঘটিয়েছিল এদেশের মানুষ। এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপকরণ, কাঁচামাল, কৌশল-প্রযুক্তি, দক্ষতা, অনুভব ও চেতনায় বস্তু সংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্প গড়ে, সৃষ্টি করে। এসব বস্তু, কারুশিল্পের মধ্যে রয়েছে লাঙ্গল, মাছ ধরার চাই, নৌকা, খালই, মাথাল, পলো, সূতি কাপড়, সন, পাটের দড়ি, মাটি, বাঁশ, সনের ঘর, কুলা, ঢেকি ইত্যাদি। মূলতঃ এদেশের প্রকৃতিকেন্দ্রিক মানুষের তৈরী সাংস্কৃতিক পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উল্লিখিত বস্তু, কারুশিল্প-বস্তুসংস্কৃতি। এসব বস্তু, কারুশিল্প এদেশের মানুষের জীবনধারার উপযোগিতার নিরীখে বাংলাদেশের আদি নৃগোষ্ঠীর কৌশল, দক্ষতা, অনুভব ও চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে এদেশে আগত অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এদেশের বস্তুসংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পে যুক্ত হয়েছে। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বস্তু, লোকশিল্প, কারুশিল্প রূপান্তরিত হয়ে কালিক ব্যবধানেও আজ অবধি প্রবহমান রয়েছে।

বস্তুসংস্কৃতি ও গ্রাম

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশের মানুষের জীবনযাপনের পরিবেশ-জীবনধারা বাংলাদেশের গ্রামগুলো ধারণ করে আছে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের বৃহত্তম অংশ-গ্রামেই আজো এদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগোরিষ্ঠ অংশ বসবাস করে। তাদের জীবনধারায় প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি সূক্ষ্ম রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে একটি ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছে। এ ভাবেই বস্তুসংস্কৃতির বস্তু ও কারুশিল্পের ক্রমপুঞ্জিত ধারাবাহিকতার প্রবহমান ধারাটি এখনো গ্রামের লোকসমাজের সাধারণ মানুষ ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে রক্ষা করে চলেছে। ফলে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বস্তুসংস্কৃতি-বস্তু, কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারার রূপান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত। সাধারণ মানুষের জীবনধারাই আবহমান বাংলার লোকজীবনধারা-লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ফলে বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে এদেশের প্রকৃতি, পরিবেশে কৃষির উপর ভিত্তি করে গ্রামের মানুষ জীবনযাপনের একটি ধারাবাহিক ক্রমপুঞ্জিত প্রবহমান জীবন ধারা, বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, বজায় রেখেছে। গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের প্রবহমান ধারাটি এদেশের লোকজীবন ধারা-লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

। বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্পের ছবি

উপজাতীদের ব্যবহৃত মৃৎপাত্র

লোকসংস্কৃতি ও বস্তু সংস্কৃতি

লোক সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা প্রধানত তিনটি ধারার মাধ্যমে সৃষ্টির পথ পায়। (১) বস্তু সংস্কৃতি (২) বাক সংস্কৃতি (৩) আংশিক বস্তু ও বাক সংস্কৃতি। এই তিনটি ধারা যথাক্রমে বস্তু-লোককারুশিল্পে, লোক সাহিত্য ও সংগীতে এবং লোক খেলাধুলা ও অভিনয়ে সৃষ্টির পথ পায়।

বাংলাদেশের লোকজীবনধারা এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিসীমায় বিকশিত ও চলমান। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঁচামাল, উপকরণ দিয়ে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে, বাঁচার, চলার প্রয়োজনে নানা জিনিস, বস্তু গড়ে, সৃষ্টি করে। এদেশের প্রকৃতির সহজলভ্য বাঁশ, বেত, কাঠ, মাটি, ঘাস, সন, পাট, তুলা ইত্যাদি কাঁচামাল দিয়ে বাংলাদেশের লোক জীবন ধারার বৈশিষ্ট্যের জিনিস, বস্তু-কারুশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে রূপলাভ করেছে বাংলাদেশের বস্তুসংস্কৃতি। বস্তুসংস্কৃতি ধারণ করে আছে দৈনন্দিন জীবনের উপযোগিতা, অর্থনৈতিক দিক এবং সৌন্দর্যগুণ। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় কালিক অথবা স্থানিক ব্যবধানে বস্তুসংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্প সাধারণ উপযোগিতা থেকে সৌন্দর্যগুণে রূপান্তরিত হয়। বস্তু সংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্প কেবল কারুশিল্পই নয় এগুলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী-গ্রামের মানুষের জীবনাচারণ, কায়িক পরিশ্রম, কর্মকান্ড, অনুভব, চেতনা, অভিপ্রায়কে ধারণ করে আছে। বাঁশ, বেত, মাটি, কাঠ, তুলা, পাট, ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উপকরণে তৈরী বস্তু-সংস্কৃতির বস্তু- কারুশিল্প এদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান ও সাংস্কৃতিক অবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। গ্রামের লোকজীবন ধারায় সচল রয়েছে। লোকজীবন ধারার সকল স্তরে, কর্মকান্ডে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বস্তু সংস্কৃতির বস্তু, কারুশিল্পের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহারকে করেছে নিশ্চিত ও বেগবান। একদিকে উপযোগিতা অপরদিকে সৌন্দর্যের, সুষমার বস্তু, কারুশিল্প এদেশের বস্তু সংস্কৃতিকে করেছে বৈশিষ্ট্যময়।

লোকজীবন ধারা

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে এদেশের মানুষের সৃষ্টি গৌণ পরিবেশ, জীবন ধারা-সাংস্কৃতিক পরিবেশ এদেশের গ্রামগুলো আজো ধারণ করে আছে। এই জীবনধারা বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই জীবনধারা গ্রামবাংলার লোকসমাজের বৈশিষ্ট্যে আবহমানকাল ধরে লালিত। এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি প্রচলিত নিয়মনীতি প্রথা, অভ্যাসের চিত্র। তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই পরিদৃশ্যমান। গ্রামীণ মানুষের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থায় গঠিত জীবন-চক্র বা জীবনবৃক্ষ দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জ্ঞাত, অজ্ঞাতসারে আমাদের গ্রামীণ মানুষকে প্রতিদিনের কার্যকলাপে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ অলিখিত নিয়ম- জীবনধারা, আচার, অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে। একটি

অলিখিত নিয়ম। এই অলিখিত নিয়ম-জীবনধারা দ্বারা বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের জীবন, জগৎ ও সংস্কৃতি পরিচালিত হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতির সাধারণ অলিখিত জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিৎ বাংলাদেশের প্রকৃতি,পরিবেশ, গ্রাম, নদীনালা, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখী এবং কৃষি। লোকসংস্কৃতির অলিখিত নিয়ম,প্রেক্ষিত, ক্ষেত্র গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জানা। এই জানা আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বন, কৃষিব্যবস্থা ও জীবনের নানা খুটিনাটি, সমাজের প্রয়োজনীয় নিয়ম শৃংখলা, নারী পুরুষের সম্পর্ক, মানুষের হাত ও হাতিয়ার এবং মননের সমন্বিত কর্মপ্রবাহের রূপ বস্তুসংস্কৃতি-লোককারুশিল্প। এজন্যই বস্তুসংস্কৃতি–বস্তুসংস্কৃতির বস্তু, লোকশিল্প, কারুশিল্প, লোক জীবনধারার, সাংস্কৃতিক, জাতিতাত্ত্বিক।

লোকজীবন ধারার এই অলিখিত নিয়ম অব্যাহত ও প্রবহমান রেখেছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সমাজ-লোকসমাজ। শত, সহস্র বছর ধরে গ্রামীণ লোকসমাজের সাধারণ মানুষ দ্বারা এই অলিখিত নিয়ম জীবনধারা লোক সাংস্কৃতিক উপাদান বস্তু, লোক ও কারুশিল্প পরিশীলিত, পরিমার্জিত এবং সূক্ষ্ম রূপান্তরের মাধ্যমে সকল সময়ের ও কালের প্রয়োজনে উপযোগিতার ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে টিকে আছে। জীবনধারা–লোক সংস্কৃতির উপাদান ও অবস্থা বস্তু-লোক ও কারুশিল্পউপযোগিতা ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও প্রবহমান।

লোকজ উৎসব, মেলা

লোকজীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসমাজের প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজ, সামাজিক রীতিনীতি (custom) মূলতঃ অতিপ্রাকৃত শক্তি, দৈববাণী, জাদুবিদ্যা প্রভৃতি অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট। লোক সমাজের প্রথায়, অভ্যাসে তার স্ফূরণ ঘটে। ফলে (custom) সামাজিক প্রথা,অভ্যাস, রেওয়াজের সঙ্গে (superstitions) অন্ধ বিশ্বাসের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অন্ধবিশ্বাসের মত সামাজিক প্রথাতেও লোক সংস্কৃতির বাকজাতীয় (verbal) ও বস্তু জাতীয় (Non verbal) উপাদান বর্তমান। লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুনির্দিষ্ট অবস্থায় তা প্রয়োগযোগ্য।

অতএব লোকসমাজের প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজ রীতিনীতি, ব্যক্তি মানুষের ও সমাজের গোষ্ঠী মানুষের আচরণ, অভ্যাসের ঢং, ধরণ ও পন্থা একটি ঐতিহ্যিক ধারা, নিয়ম। এই প্রথা, অভ্যাস কালিক ব্যবধানে অনুকরণ, অনুসরণের মধ্যদিয়ে অব্যাহত, সচল থাকে। এবং ক্রমাগত সামাজিক চাপ, ব্যবহারে, পালনে সার্বজনীনতা লাভ করে এবং পূর্বপুরুষের অধিকারের তাগিদ, সামাজিক প্রথা, অভ্যাস, রেওয়াজ লোক সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়। যখন প্রথা কোন আমোদের দিনকে নির্দিষ্ট করে দিনকে ঘিরে আমোদ হয় তা পরিণত হয় পঞ্জিকার অন্তর্ভূক্ত প্রথায়। যখন এ ধরণের আমোদের, আনন্দের দিনকে ঘিরে কোন প্রথা পুরো লোকসমাজের মানুষ বার্ষিকভাবে উদযাপন, অনুষ্ঠান করে তা পরিণত হয় পরিপূর্ণ উৎসবে। (Brunvand J. H : 1969)

মূলতঃ লোকজীবনে (folk life) কোন লোক সমাজের মানুষের ঐতিহ্যিক দিক লোকসাহিত্য, সংগীত, আচার- আচরণ, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং বস্তুসংস্কৃতি- লোক কারুশিল্প। এ কারণে লোকজীবনের অন্তর্ভূক্ত প্রথা (custom) লোক সমাজের মানুষের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বার্ষিক আমোদের, আনন্দের অনুষ্ঠান-উৎসবের গুরুত্ব সাংস্কৃতিক, জাতিতাত্ত্বিক। বার্ষিক আমোদ ও আনন্দকেন্দ্রিক উৎসবের (festival) প্রথা (custom) কখনো ধর্মীয়, কখনো ধর্ম নিরপেক্ষ। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের যে প্রথা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নবান্ন, নববর্ষ এবং পৌষ উৎসব, মেলা। এছাড়া ধর্মীয় ঈদ, মহররম, বিভিন্ন পূজা, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব মেলা। এ সব দিনে উৎসব মেলা আয়োজনের ঐতিহ্যিক প্রথা (custom) আমাদের লোক জীবনের ঐতিহ্য। এভাবেই উৎসব, মেলা সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সামাজিক প্রথাই উৎসবের, মেলার আয়োজনের মূল। প্রথায় সংযুক্ত রয়েছে বাক সাংস্কৃতিক ও বস্তুসাংস্কৃতিক উপাদান অতএব প্রথা পালনের জন্য আয়োজিত উৎসবে লোকসংস্কৃতির বাকসংস্কৃতি ও বস্তুসংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্পের মত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের আদান প্রদান উৎসব, মেলার প্রধান কার্যক্রম। ঐতিহ্যের ক্রমপুঞ্জিত ধারায় লোকজীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উৎসব, মেলায় গ্রামের সাধারণ মানুষ তার সাংস্কৃতিক উপাদানের আদান প্রদানের লক্ষ্যে মিলিত হয় আমোদ ও আনন্দকে উপলক্ষ্য করে। এভাবেই উৎসব, মেলা একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। লোকজীবন ধারায় প্রথা হিসেবে লোকজ উৎসব, মেলা লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আজঅবধি সক্রিয়, প্রবহমান এবং অব্যাহত।

গ্রামীণ লোকজীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকমেলা। প্রতি বছর নানা পাল-পার্বণে ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে আয়োজিত লোকমেলার রয়েছে লোকজীবনের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। এবং লোকজীবনধারার পরিচায়ক বস্তু-সংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের প্রসার, উৎকর্ষ, যোগাযোগ, বাজার ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র লোক মেলা। উপলক্ষ্য হিসাবে কখনো ধর্মীয়, কখনো কৃষিভিত্তিক জীবনের আচার অনুষ্ঠানগত রূপের পরিসীমায় মেলা আয়োজন করা হয়। এভাবেই মেলা একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ লোকজীবনের সার্বিক উন্নয়নকে মেলায় তুলে ধরা, ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়। সেই সংগে লোকসমাজের সকল স্তরের বয়সের মানুষের মধ্যকার একটি বাস্তব যোগাযোগ যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক। ফলে মেলা হয়েছে আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র এবং আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের অতি পরিচিত, প্রাণের, জীবনের আনন্দের ক্ষেত্র। এভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির লালন, রূপান্তরের ক্ষেত্রই বলা চলে মেলাকে।

বাংলাদেশের মেলা এদেশের মানুষের গোষ্ঠীগত চেতনার নানা প্রাচীন অনুষঙ্গ, চিত্র, বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যের নানা দিকের অজানা তথ্য, তত্ত্ব আবিস্কারের অবশেষ ক্ষেত্র।

মেলা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ যে ধরণেরই হোক না কেন গ্রামীণ পরিবেশের মানুষের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খা, উন্নয়ন, মেলার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ লোক সমাজের চাহিদার উপর ভিত্তি করেই মেলার চালচিত্র, বৈশিষ্ট্য সৃজিত, হয়ে থাকে। জীবনের প্রাত্যহিকতাকে পরিপূর্ণ করতে একদিকে কৃষি উপকরণ অপরদিকে দক্ষ হাতের তৈরী বস্তু, দ্রব্য-লোক ও কারুশিল্পের বিনিময়, লেনদেন মেলার একটি বড় কার্যক্রম।

আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে লোকজীবনে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান, চলার পথে মেলা এবং সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নয়নকে অবলোকন করার আনুষ্ঠানিক আয়োজন হচ্ছে লোকমেলা। লোক সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান, অবস্থা বস্তুসংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্পের প্রসার ও আদান প্রদানের ক্ষেত্র লোকমেলা বাংলাদেশের মানুষের লোকজীবন ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বস্তুসংস্কৃতি ও লোকজ উৎসব, মেলা

লোকজ উৎসব, মেলা লোকজীবনের প্রথা, সংস্কার। লোকজ উৎসব ও মেলা লোকজীবনের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও জীবনধারণকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অবস্থা। ফলে উৎসব ও মেলা ধারণ করে আছে লোকসংস্কৃতির সকল উপাদান-বস্তু, বাক এবং আংশিক বস্তু ও বাক সাংস্কৃতিক উপাদান। মূলতঃ লোক সমাজের প্রতিদিনের জীবনযাপনে চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপকরণকে মানুষ তার বসবাস, জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশের প্রয়োজনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত, সৃষ্টি করে। বস্তু হয় জীবন যাপনের-লোকজীবনের জীবনধারার অনিবার্য অংশ। বস্তু পরিণত হয় সাংস্কৃতিক উপাদানে। সব মিলিয়ে এই বস্তুকে সনাক্ত করি বস্তুসংস্কৃতি বলে। বস্তু সংস্কৃতির বস্তু লোকজীবনের জীবনধারার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে এর সংগে লোকজ উৎসব ও মেলাও সম্পৃক্ত। আর বস্তুসংস্কৃতির বস্তু, জিনিস লোকসমাজের সাধারণ মানুষের অনুভব, চেতনা, কৌশল ও দক্ষতায় সৃষ্টি হয়। এর ফলে বস্তু সংস্কৃতির বস্তুর বিস্তৃতি প্রয়োজনের থেকে সৌন্দর্যের। এই বস্তু-লোককারুশিল্পের উপস্থিতি লোক জীবনধারার প্রতিটি ক্ষেত্রে, স্তরে। লোকজউৎসব, মেলায় লোকজীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বস্তু সংস্কৃতির বস্তু-লোক কারুশিল্পের লেনদেন, কেনাবেচার আয়োজন উৎসবও মেলার মতই একটি দীর্ঘস্থায়ী লোকজ প্রথা, সংস্কার। এজন্যই লোকজ উৎসব, মেলায় বস্তু সংস্কৃতির বস্তু-লোক কারুশিল্পের সামগ্রীর পসরা, কেনাবেচা, লেনদেন একটি প্রথা। এবং এটা লোকজ উৎসব, মেলার প্রধান আকর্ষণ। লোক ও কারুশিল্পের শিল্পী, কারিগরের সংগে ক্রেতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সম্মিলনের কেন্দ্রস্থল লোকজ উৎসব, মেলা মোট কথা লোকজীবনের (Folklife) সংগে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের লোকজীবন এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও সীমারেখায় সৃষ্ট কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। লোকজীবন ধারার এইপ্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশের

জামদানী শাড়ির দৃশ্য

লোকসংস্কৃতি, বস্তু সংস্কৃতির গড়ন, রূপ নির্ধারিত হয়েছে। গ্রামীণ কৃষিজীবন ভিত্তিক লোকজীবনধারার প্রয়োজনীয় বস্তুসংস্কৃতির-লোক কারুশিল্প এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান, কাঁচামাল, উপকরণের তৈরী। লোকজীবন ধারায় মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু-বস্তু সংস্কৃতি-লোককারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত। এর শ্রেণীকরণ এ ভাবে হতে পারে ঃ

১. কৃষি কাজের সরঞ্জাম ঃ লাঙ্গল; বাঁশের ঝুড়ি ; ধানের গোলা ; ধান, চাল মাপার বাঁশের বেতের কাঠা; বাঁশের, বেতের মাথাল; ঢেকি; কুলা; বাঁশের খালই; ধামা।

২. গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস ঃ মাটির হাঁড়ি; পাতিল, কলসি, সানকি, বাটি, গামলা, চারি; কাঠের চামচ; নারকেলের মালার চামচ, তালপাতার ও বাঁশের–বেতের পাখা; বাঁশের ঝুড়ি; কাঠের বাক্স; পাটের সিকা; শীতল পাটি; হোগলা; মাদুর; শতরঞ্জী; প্রদীপ-দান।

৩. বাসস্থানের জন্য ঃ মাটির, বাঁশের, বাঁশ-সনের ঘর। বাঁশের বেড়া, বেলকি, দরমা, কাঠের দরজা, জানালা, চৌকাঠ।

৪. বস্ত্র পরিচ্ছদ ঃ সূতিবস্ত্র, শাড়ী, লুঙ্গী. ধুতি, নকশীকাঁথা, গামছা, ফতুয়া। এবং উপজাতি, ও আদিবাসীদের পোশাক, পরিচ্ছদ।

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনে ঃ নৌকা, গরুর গাড়ী, পাল্কী।

৬. মানুষের সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত ঃ বাঁশের বাশী, ঢোল, কারুকার্যময় কাঠের, বাঁশের জিনিস, একতারা, দোতারা।

৭. শিশুদের আনন্দ বিধান ঃ মাটির পুতুল, বাঁশের, কাঠের খেলনা, হাতী, ঘোড়া, পুতুল, গরুর গাড়ী।

৮. ধর্মীয়, লোকজ বিশ্বাস ঃ মাটির কাঠের তৈরী প্রতিমা, মূর্তি, কাঠের মূর্তি, মাটির তৈরী লক্ষ্মীসরা। পাটি-জায়নামাজ, নকশীকাঁথা জায়নামাজ, কোরানের গিলাফ, পটচিত্র।

৯. সাধারণ আসবাব ঃ জলচৌকি, কাঠের পিড়ি, কাঠের বাক্স, কাঠের তাক, বাঁশের, বেতের বাক্স, ঝুড়ি।

১০. অঙ্গের সাজসজ্জা ঃ লোকঅলংকার, পুতির মালা।

লোক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বস্তুসংস্কৃতি-লোক কারুশিল্প মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। এবং বস্তু সংস্কৃতির এই বিস্তৃত ভান্ডারের প্রসারের ক্ষেত্র লোকজ উৎসব, মেলা। বছর ঘুরে এক একটি লোকজ উৎসব, মেলা এক একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসূচক বস্তু সংস্কৃতির নিদর্শন লোক কারুশিল্পের উৎপাদন, সৃষ্টির ধারাকে করেছে বেগবান। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এভাবেই উৎসব, মেলা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। বস্তু সংস্কৃতির বস্তু-কারুশিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি, পৃষ্ঠপোষকতার পরিবেশ সৃষ্টিতেও উৎসব, মেলা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশের লোকজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ লোকজ উৎসব, মেলা এদেশের বস্তুসংস্কৃতি-লোক কারুশিল্পের কেন্দ্র এই ঐতিহ্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অর্থাৎ হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের বস্তুসংস্কৃতি লোককারুশিল্পের বিক্রয় ও প্রসারের কেন্দ্র লোকজ উৎসব, মেলা। লোকজ উৎসব ও মেলা যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural trait) এবং একই সঙ্গে একধরণের সাংস্কৃতিক অবস্থাও বটে (Culture complex)

বস্তুসংস্কৃতি-লোক কারুশিল্প আমাদের দেশের লোক জীবনধারা-সংস্কৃতির অবকাঠামো সৃষ্টির কাজটি করে থাকে। সেই সংগে লোকজীবনধারা– লোকসংস্কৃতির বাক জাতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান-উপরিকাঠামোকেও যুগপৎ ধারণ করে। জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বস্তু সংস্কৃতির-বস্তু, লোক কারুশিল্পের মূল্য, গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ বস্তুসংস্কৃতি-লোক কারুশিল্প লোক সমাজের মানুষের লোকজীবন ধারা-লোক সংস্কৃতিকে ধারণ করে। এজন্য বস্তু সংস্কৃতির বস্তু, লোক কারুশিল্প জাতিতাত্ত্বিক। এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রথমে বস্তু সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত বস্তু-লোক কারুশিল্পের অসংখ্য নমুনার দলিলীকরণ করা অপরিহার্য। আঞ্চলিক-স্থানিক, ও কালিক ব্যবধানে বহু বিচিত্র ধরণের অসংখ্য বস্তু সংস্কৃতি-লোক কারুশিল্প ক্রমাগত সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে চলমান, অব্যাহত রয়েছে। এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যের লোকজীবনধারার আজঅবধি ক্রমপুঞ্জিত রূপান্তরিত ধারাবাহিকতার রূপকে বস্তু সংস্কৃতির বস্তু, লোককারুশিল্প ধারণ করে সচল, অব্যাহত রয়েছে।

লোকজউৎসব ও মেলায় বস্তুসংস্কৃতি–লোককারুশিল্পের উল্লিখিত লোকজীবন ধারাকেন্দ্রিক ব্যবহারগত শ্রেণীভিত্তিক নমুনা কেনা বেচা, লেনদেন হয়ে থাকে। এই নিয়ম ও ধারাটিও আমাদের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রথা, রেওয়াজ, এবং সংস্কার। আবহমানকাল থেকে আজ অবধি আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় সকল উৎসব, মেলায় এক এবং অভিন্ন ঐতিহ্য অনুসৃত হচ্ছে। এবং লোকজ উৎসব, মেলা আমাদের লোকসমাজের লোকজীবন ধারার সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী বস্তুসংস্কৃতি-লোক কারুশিল্পের প্রদর্শন, প্রসার, বাজারের আদর্শ কেন্দ্র। বাংলাদেশের লোক জীবনধারা–লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটি এখনো এদেশের গ্রামের মানুষের অনুভব চেতনায়, জীবনযাপনে সক্রিয়। ফলে লোকজীবনধারা–লোকসংস্কৃতির তাগিদ, প্রথা, নিয়ম, রেওয়াজ লোকজ উৎসব মেলাকে একটি সংস্কার হিসেবে আবহমানকাল থেকে আজ অবধি আয়োজন করা হয়। লোকজ উৎসব, মেলার এই আয়োজন ঐতিহ্যিক ধারার পাশাপাশি স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে নবনব রূপে লোকজ উৎসব, মেলা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে রূপলাভ করে চলেছে।

বস্তুসংস্কৃতির দলিলীকরণ ও লোক মেলা

যেহেতু বস্তুসংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্প আমাদের গ্রামীণ লোকসমাজের মানুষের লোকজীবন ধারা-লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করে অর্থাৎ লোক সংস্কৃতির স্বভাব-আচরণ, জীবনধারা বস্তু-কারুশিল্পের নিদর্শনে আরোপিত, স্থির, নির্ধারিত সেহেতু বাংলাদেশের লোকমেলা গুলোতে কারুশিল্পীদের বিক্রির জন্য নিয়ে আসা বস্তুসংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের গড়ণ, ব্যবহার, রং, রূপ বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক মেলায় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় বস্তু সংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্প আকর্ষণের বিষয়। এর অনুপুংখ দলিলীকরণ হলে বস্তু সংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্পের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, তারতম্য, পার্থক্য সনাক্ত করা সম্ভব হবে। মূলতঃ লোক মেলার সংগে বস্তুসংস্কৃতি-লোক ও কারুশিল্পের সম্পৃক্ততা মেলার সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লোক মেলার এই ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। এ জন্য যে কোন ধরণের মেলার সংগে বস্তুসংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের একটি যোগাযোগ রয়েছে।

বস্তুসংস্কৃতি, লোকও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব'৯৬

মেলা যেমন ধর্মীয়, লোকজ আচার উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তেমনি জাতীয় উদ্দীপনা, উজ্জীবনে, মর্যাদার জন্যও যেমন স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন সংযোজন, এ ধরণের মেলা এ দেশের মেলার ঐতিহ্যের উপাদানগুলোকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এবং মেলারঐতিহ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৫০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে গত ১৯৮০ সাল থেকে অনুরূপ লোকমেলার আয়োজন করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ফাউন্ডেশন একদিনের, পরে দুই অথবা তিনদিনের বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। এবং এই পর্যায়ে ১৯৯১ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৯২ সালে এই মেলা সাত দিনের মেলায় পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ থেকে ফাউন্ডেশন দেশে দীর্ঘতম একটানা একমাসের লোকও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করে। এ ভাবেই ফাউন্ডেশন দেশে দীর্ঘতম একটানা একমাসের লোকও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করছে। ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই লোক কারুশিল্প মেলা ক্রমশ দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত মেলায় পরিণত হতে চলেছে।

১৯৯৬ সালেও প্রতিবছরের মত ফাউন্ডেশন লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব'৯৬ আয়োজন করে। ফাউন্ডেশনের লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব দেশের লোকজীবন ধারা-লোকসংস্কৃতির ধারার মত একটি তাগিদ, প্রথা, নিয়ম রেওয়াজে পরিণত হতে চলেছে। লোক ঐতিহ্যের সংস্কারের অনুসরণে এই লোক মেলার আয়োজন হচ্ছে প্রতিবছর। প্রতিবছর এই মেলার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সোনারগাঁয়ের আশে পাশের থানা ও জেলার সাধারণ মানুষ এবং মহানগরী ঢাকার নাগরিক। এ ছাড়া সারা দেশের লোকসংগীত শিল্পী ও কারুশিল্পীগণ, পুরো বৈশিষ্ট্যই লোক মেলার বলা চলে।

ফাউন্ডেশন আয়োজিত লোক ও কারুশিল্প মেলা '৯৬ বাংলাদেশের অন্যান্য লোক মেলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে ক্রমশঃ মেলার রূপ পরিগ্রহ করছে। সংস্কৃতির মতই প্রবহমান ধারায় এই পথ চলা। লোক জীবন ধারা–লোক সংস্কৃতির তাগিদ, প্রথা, নিয়ম,রেওয়াজে পরিণত হতে চলেছে এই মেলা। লোক মেলার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই মেলায় স্বাভাবিক নিয়মে এদেশের লোকজীবন ধারার ঐতিহ্যের নিরীখে বস্তুসংস্কৃতির বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের পসরা সাজে। আমাদের গ্রামবাংলার লোকজীবনধারার প্রতিদিনের প্রয়োজনের বস্তু লোক ও কারুশিল্প এই মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। এ সব বস্তু-লোক ও কারুশিল্প লোক ঐতিহ্যের ধারায় প্রয়োজনের, উপযোগিতার এবং সৌন্দর্যের।

এই মেলায় বস্তু সংস্কৃতির যেসব বস্তু লোকও কারুশিল্পের সমাহার ঘটেছে সেগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রয়োজনের, উপযোগিতার।

(খ) প্রয়োজনের, উপযোগিতার এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের।

(গ) কেবলই সৌন্দর্যের।

বাঁশ ও পাটের তৈরী জিনিসের স্টল

এই মেলায় প্রয়োজনের, উপযোগিতার জিনিস, বস্তু–লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত যে সব বস্তু–লোক ও কারুশিল্প ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা এনেছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘরের মেঝেতে বসার কাঠের পিড়ি, রুটি বানানোর পিড়ি, কাঠের চামচ, ডাল ঘুটনি, বেলনা, কোরান পড়ার কাঠের রেহাল, খাট, আলনা, টেবিল, চেয়ার, মসলার পাত্র, কাইল এগুলো নরসিংদী থেকে কারুশিল্পী, ব্যবসায়ীরা মেলায় বিক্রির জন্য এনেছে। এরা বিভিন্ন মেলায় এ সব জিনিস বিক্রি করে।

এছাড়া বাঁশের ঝুড়ি, কাঠা, মাটির কলসীও মেলায় বিক্রির জন্য আসে। প্রয়োজন, উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য এই দুই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যময় জিনিস, বস্তু-লোক, ও কারুশিল্পের মধ্যে রয়েছে বাঁশের নকশী পাখা, কাপড়ের ও রঙ্গীন সূতার নকশী পাখা, এগুলো শিল্পী নিজেই তৈরী করে মেলায় বিক্রির জন্য এনেছে। বাঁশের নকশী পাখার শিল্পীর নাম হাছান মিয়া। এবং কাপড়ের, সূতার পাখার কারুশিল্পীর নাম অরুনবালা এই শ্রেণীর কারুশিল্পের মধ্যে মেলায় আরো সমারোহ ঘটেছিল মানিকগঞ্জের কারুশিল্পী হামিদ মোল্লা তৈরী বাঁশের নকশী বেড়া, বেলকী।

কেবল সৌন্দর্যের জিনিস বস্তু-লোক ও কারুশিল্পের অন্তর্ভূক্ত যে সব বস্তু মেলায় সমারোহ ঘটেছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল সোনারগাঁয়ের কারুশিল্পী মনীন্দ্র চন্দ্র সূত্রধরের তৈরী কাঠের চিত্রিত চাকাওয়ালা ঘোড়া, হাতী এবং পুতুল। এ ছাড়া মাটির তৈরী বিভিন্ন ধরণের ফল যেমন, কাঠাল, আম, ঝুনা নারকেল, বেগুন, আতা, তাল ইত্যাদি। এসব জিনিস গ্রামের ফেরিওয়ালা ধরণের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ঢাকার রায়ের বাজার, নরসিংদী, কুমিল্লা থেকে কারুশিল্পীদের কাছ থেকে পাইকারী হারে কিনে এই মেলায় বিক্রী করছে। এ সব ফেরিওয়ালা এবং কারুশিল্পী বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী কখন কোথায় কয়দিনের, ধর্মীয় কারণ, লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের বা ঐতিহ্যগত ভাবে লোকমেলার আয়োজন হয়ে থাকে তার খবর তারা রাখেন। এখন নতুন ভাবে আয়োজিত লোক মেলা গুলোর খবরও এরা গ্রামের হাটে, বাজারে লোকমুখে লোকমেলার খবর পেয়ে যান।

বস্তু সংস্কৃতির বস্তু–লোক কারুশিল্পের বিক্রয়, প্রসার, ও বিকাশের ক্ষেত্রই লোকমেলা। এই ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে লোকমেলাগুলোতে লালিত হচ্ছে। লোকজীবন ধারায় লোক সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক অবস্থা, উপাদান হিসেবে মেলা ও বস্তুসংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য। এর অনুপুংখ দলিলীকরণে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি— লোকও কারুশিল্পের স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে যে রূপ পরিগ্রহ করে, যে বৈচিত্র রয়েছে, বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়, তা সনাক্ত করা সম্ভব। এর ক্ষেত্র লোক মেলা। ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-৯৬ এ বস্তু সংস্কৃতির বস্তু–লোক ও কারুশিল্পের সমারোহের যে চিত্র পাওয়া গেল তাতে আঞ্চলিক লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Felix M. Keesing, Cultural Anthropology, 1965: 197

২. Lowie, R. H. 1940, An Introduction to Cultural Anthropology, New york

৩. Jan Harold Brunvan, The Study of American Folk lore 1969:198

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ফাউণ্ডেশনের লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব '৯৬ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদন

বাংলার বাণী
তারিখ ঃ ২৪-৩-৯৬

শেষ হলো সোনারগাঁয়ের লোকজ উৎসব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ শুরু হয় এ লোক মেলা। প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও যথেষ্ট ভালো অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন এ বারের মেলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রামের বিখ্যাত করিয়াল সাধন আচার্য, অন্ধ বাউল শামসু দেওয়ান, আবুল সরকার, আকলিমা, সোনামিয়া বয়াতী, শাহনাজ তালুকদার, কুদ্দুছ বয়াতী, জালাল দেওয়ান, লতিফ সরকার, মোয়াজ্জেম সরকারসহ দেশের লোক শিল্পীগণ লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এবার ১০টি গ্রামীণ হারিয়ে যাওয়া খেলাধুলা প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। বিভিন্ন গ্রামীণ লোকচারের ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষয়ের বাস্তব বা জীবন্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যেমন গ্রাম্য সালিশী, বৈঠক, বিয়ে পড়ানো, বাঁশী বাজানো, খৈ মুড়ি ভাজা ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শিত হয়েছে। মেলায় স্থায়ী স্টল ছিল ২২টি আর মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর ৮২ টি স্টল বসেছিল। বিচিত্র সামগ্রী নিয়ে মেলা জমজমাট হলেও বহিরাগত লোকজনের অনুপস্থিতি মেলাকে অনেকটা ম্লান মনে হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাস্তব জীবনের অনেক হতাশা, বিষাদময়তা থাকলেও মেলায় এসেছে প্রচুর বয়সী লোক, একটু নিটোল আনন্দে সিক্ত হতে চেয়েছে। হেসে খেলে সন্ধ্যা আসরে সময় অতিবাহিত করেছে। ক্ষণিকের জন্য হলেও সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে লোক নাটক, গল্প বলা আর ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, মাইজভাণ্ডারী গানের সুরে তন্ময় হয়ে একাত্ম হয়ে যেতে দেখা গেছে দর্শকদের। এবারের ব্যতিক্রম ছিল ৬টি বিশেষ বিষয়ের উপর সেমিনার। যা ইতিপূর্বে বাংলাদেশের কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। যেমন লোকজ খেলাধুলা, মৃৎশিল্প, জামদানী শিল্প, পাটজাত কারুপণ্য, নক্সীকাঁথা ইত্যাদি। এসব বিষয় ভিত্তিক সেমিনার গ্রামীণ পরিবেশে আয়োজনের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ বিদগ্ধজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। এসব সেমিনারগুলোতে প্রচুর দর্শক শ্রোতার উপস্থিতি অতিথি সাংবাদিক ও আলোচকবৃন্দের তুষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে।

মেলায় বেচা কেনা অন্যান্য বছরের তুলনায় কম হয়েছে। তবে রাঙ্গামাটি থেকে আগত উপজাতীদের একটি স্টলে প্রায় লক্ষের কাছাকাছি টাকা বিক্রি হয়েছে বলে জানা যায়। কিছু কিছু অভিযোগ থাকলেও কর্তৃপক্ষের সার্বিক আয়োজন ছিল প্রশংসনীয়।

এ, কে, এম মাহফুজুর রহমান।

বাংলার বাণী
তারিখ ঃ ২১-৩-৯৬

হারিয়ে যাওয়া খেলাধুলার পুনরুজ্জীবন হচ্ছে সোনারগাঁয়ের লোকজ উৎসবে

গ্রামীণ হারিয়ে যাওয়া খেলাধুলা নিয়ে সোনারগাঁয়ে লোক কারুশিল্প মেলায় ইতিমধ্যে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। অনেক খেলা ছিল একসময় গ্রামবাংলায় বহুল প্রচলিত। কিন্তু কালের আবর্তে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। আশার কথা সোনারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গত বছর থেকে আমাদের ঐতিহ্যের ধারক প্রাচীন খেলাধুলা নিয়ে স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। গত বছর ১০টি খেলার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এগুলো ছিল কইল্যা খেলা, পালান টুকটুক, একপা খেলা, মন পবনের নাও,দাড়িয়া বান্দা, ওপেনটি বাইসকোপ, কাঠি ছোঁয়াছুয়ি, টোক্কা টুক্কি, রুমাল চুরি ও নোনতা খেলা। এসব খেলা বাড়তি কোন উপকরণ ছাড়াই খেলা হত। কেবল অঙ্গভঙ্গী ও ছড়া কেটে এসব খেলা অনুষ্ঠিত হত। এবারও উৎসবে ১০টি প্রাচীন গ্রামীণ হারিয়ে যাওয়া খেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের দ্বারা।

ইত্তেফাক
৪-৩-৯৬

ফিরে চল সুবর্ণ গ্রাম

তরুণ, সহকর্মীদের নিয়ে ঢাকায় একদিকে যেমন গড়ে তুলেছিলেন আর্ট স্কুল ও কলেজ,তেমনি পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণের। তাঁর পরিকল্পনার অংশ ছিল একটি বিশাল খোলা 'শিল্প-গ্রাম' প্রতিষ্ঠা করা। যে গ্রামে কাজ করবে কুমার, তাঁত বুনবে তাঁতী, কুলু ভাংবে তেল আর কামার গড়বে দৈনন্দিন ব্যবহার্য লোহার হাতিয়ার। সে গ্রামে প্রবেশ করলে একনজরে দেখা যাবে আবহমান বাংলাকে। সে গ্রামকে সাজানো হবে এমনভাবে যেখানে এলেই দেশী,বিদেশী শিল্পানুরাগী পর্যটকগণ সমগ্র বাংলাদেশকে দৃশ্যমান দেখতে পাবেন। শিল্পাচার্য জয়নুলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া এবং দেশের নতুন প্রজন্মের সামনে হারিয়ে যাওয়া দেশীয় শিল্প সম্ভারকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অতীত ইতিহাস সমৃদ্ধ সুবর্ণ গ্রাম অর্থাৎ আজকের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও-এ গড়ে উঠেছে লোকশিল্প যাদুঘর তথা "বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।"

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন এবং রূপান্তরের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত।

দেশবাসীর বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো ও বিদেশীদের কাছে গ্রাম বাংলায় বহু বছরে গড়ে ওঠা শিল্প-সম্ভারকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই গত কয়েক বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে 'লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এর।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ঐতিহাসিক সোনারগাঁও এ শুরু হয়েছে পঁচিশদিনব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব। অতীত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ সোনারগাঁও সেজেছে নতুন সাজে। দেড়শ বিঘায় বিস্তৃত,প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা লোকশিল্প যাদুঘর প্রান্তর এখন বাঁশীর সুর, চরকার বোঁ-বোঁ আর বাউলের একতারার টুং-টাং শব্দে মুখরিত। থরে থরে সাজানো হয়েছে লোকশিল্পের নিদর্শন-হাত পাখা, চিত্রিত হাঁড়ি, মুখোশ, পটচিত্র, কুলা, আলপনা, পাটা, নক্শী কাঠ ও মাটির পুতুল, কাঠ খোদাই, খড়ম, বিয়ের পিড়ি, দেয়ালচিত্র, নকশী কাঁথা, বাঁশ, বেতের নকশী কাজ, নকশী পিঠা, পালকী, পাটের শিকা, শীতল পাটি, নকশী ছাঁচ, চিনির পুতুল, হাওয়াই মিঠাই, অলংকার, পিতল-কাঁসার কাজ, মাটির পাত্র, হাতের চুড়ি, মাথার ফিতা, কানের দুল ও কাঠের আসবাবপত্রসহ নিত্যদিন ব্যবহারযোগ্য অসংখ্য সামগ্রী দিয়ে, যার প্রতিটি সৃষ্টি হয়েছে এদেশেরই অচেনা অথচ দক্ষ কারুশিল্পীদের হাতে। যুগ-যুগান্তর ধরে গড়ে ওঠা এসব শিল্পের গায়ে অঙ্কিত হয়েছে স্বল্প ও অশিক্ষিত শিল্পীর মনের শৈল্পিক অনুভূতি। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে এসে তারা সাজিয়েছে তাদের পসরা।

গ্রাম-বাংলার ঘর-বাড়ি, ঘরের বেড়া, চাল, দরজা ইত্যাদি একসঙ্গে দৃশ্যমান করার জন্য ছন ও বাঁশ দিয়ে মেলা উপলক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছে বিভিন্ন স্টল।

লোক সংস্কৃতির প্রধানতম উপাদান হচ্ছে লোক সংগীতের অমূল্য ও অমৃত ধারা। মেলায় বাউল, জারী, সারি, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি, লালনগীতি, হাসনরাজার গান, বিয়ের গান, বিচার গান, ধুঁয়া গান, মাইজভান্ডারী গান, মারফতী, মুর্শিদী, দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালী, কবিগান, মেয়েলীগীত, বিয়ের গান, বৃষ্টির গান-এর আয়োজন করা হয়েছে বাঁশ, ছন ও বেত দিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে। মেলা চলাকালে প্রতিদিন এই মঞ্চ থেকে পরিবেশিত হবে মন-হরণ করা মোহনীয় সংগীত। সেইসঙ্গে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত থাকছে যাত্রা ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, মোরগ লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো, সাপের খেলা, লাঠি খেলা ইত্যাদি বাংলাদেশের লোক-ক্রীড়ার অন্যতম। এদিকটি বিশেষ বিবেচনায় এনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণ ক্রীড়াবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উৎসবে অংশগ্রহণের। জীবন্ত প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে মেলায় প্রদর্শিত হচ্ছে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান, বিয়ের আসর, মুড়ি খৈ ভাজা, পঞ্চায়েতী সালিশ ও গ্রাম্য পাঠশালা-মক্তবের কার্যক্রম। লোকশিল্প আমাদের প্রাণের উৎস, অস্তিত্বের অহংকার। সোনারগাঁও-এ আয়োজিত এই লোকজমেলা ও উৎসবের মধ্যদিয়ে রুচির দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে একদিন আমরা আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে রচনা করবো শিল্প সমৃদ্ধির সেতুবন্ধন। সেইসঙ্গে নগর সভ্যতার হাজারো কোলাহলের মধ্যেও আমরা ফিরে পাবো আমাদের শেকড়ের সন্ধান, সুবর্ণ গ্রাম! তাহলেই হয়তো সফল হবে জয়নুলের স্বপ্ন।

মনজুরুর রহমান।

ইত্তেফাক
৮-৩-৯৬

সোনারগাঁয়ে আনন্দমুখর লোকজ মেলা

ঈশাখাঁর রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁওয়ে কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব শুরু হয়েছে। আঁকা ছবির মতন ছায়াঢাকা মায়াময় নিঝুম গ্রামে অবস্থিত কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের বিশাল অঙ্গন মেতে উঠেছে আনন্দমুখরতায়। প্রতিদিন অপরাহ্নর অলসতা ভেঙ্গে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে শত শত মানুষ আসছে সোনারগাঁওয়ে। গ্রামের প্রতি হৃদয়ের টান, নষ্টালজিয়া আর গভীর ভালোবাসার আকর্ষণে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরের উৎসবপ্রিয় মানুষ ভীড় করছে শিল্পাচার্যের অপার মমতায় গড়ে তোলা এই 'শিল্পগ্রামে'।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। বাঁশ, বেত, কাঠ, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি তৈরী হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পসহ ১০৩টি স্টলে বিভিন্ন কারুপণ্যের সম্ভার শোভা পাচ্ছে। পাশাপাশি মুড়ি-মুড়কি হতে শুরু করে হাল-আমলের পোষ্টার, ভিউকার্ড, বই-পত্রের বিকিকিনিও হচ্ছে। মেলায় জনপ্রতি ৫ টাকার বিনিময়ে নৌকা ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন খেলাধুলার। উৎসবের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালায় এই বছর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কারুশিল্পকে। দেশের লোকসঙ্গীতের ধারা ঃ বাউল, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, লালনগীতি, পালাগান, ভাটিয়ালী, মাইজভান্ডারী, মারফতী, মুর্শিদী, মেয়েলী গীত, বিয়ের গানের আসর বসছে। প্রতিদিন গ্রামীণ খেলা এবং বিয়ে পড়ানো, গ্রামীণ বিচার, রাখালের বাঁশি বাজানো, মুড়ি খৈ-ভাজা ও পায়ে আলতা পরানোর প্রদর্শনী উৎসবের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। পুতুল নাচ ও যাত্রা প্রদর্শনীরও আয়োজন রয়েছে। শিশুদের জন্য নাগরদোলা চড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসাবে উৎসব চলাকালীন একমাসে অনুষ্ঠিত হবে ৬টি সেমিনার। গত শুক্রবার বাংলাদেশের লোকজ খেলার অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা শীর্ষক প্রথম সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ

আশরাফ সিদ্দিকী। ৫ই মার্চ বিকাল ৪টায় হয়েছে জামদানীর অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা শীর্ষক সেমিনার। আজ (শুক্রবার) "মৃৎশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা", ১৫ই মার্চ "নকশী কাঁথার অতীত বর্তমান, ও রূপান্তরের ধারা", ১৯শে মার্চ 'পাটজাত কারুশিল্পের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা', ২২শে মার্চ "লোক ঐতিহ্যের অতীত, বর্তমান ও রূপান্তরের ধারা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পন্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা করবেন। উৎসব চলবে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন অপরাহ্ন আড়াইটা হতে গভীর রাত পর্যন্ত একটানা বিভিন্ন অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। ছুটির দিনে সকাল হতে মেলা শুরু হয়। উৎসব শেষে মেলায় অংশগ্রহনকারী দেশের অবহেলিত অথচ সৃষ্টিশীল ও দক্ষ কারুশিল্পী ও লোকসঙ্গীত শিল্পীদের পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। উৎসব উপলক্ষ্যে এবার রাজধানীতেও ব্যাপক প্রচারণা চালান হচ্ছে। একদল বাউল রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে উন্মুক্ত ট্রাক থেকে মেলার প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন সড়ক মোহনায় ফেষ্টুন ব্যানার, ঢোলক টাঙ্গানো হয়েছে। মেলার পোষ্টার সাঁটা হয়েছে দেয়ালে-দেয়ালে। তবে রাজধানীর উৎসব প্রিয় অনেক মানুষ সোনারগাঁওয়ে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রতিকুলতার কারণে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছেন না। মেলা উপলক্ষ্যে ঢাকা হতে সোনারগাঁওয়ে সুগম যাতায়াতের জন্য বিআরটিসিকে একটি বাস বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছিল ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা রাজী হয়নি।

আনোয়ার আলদীন

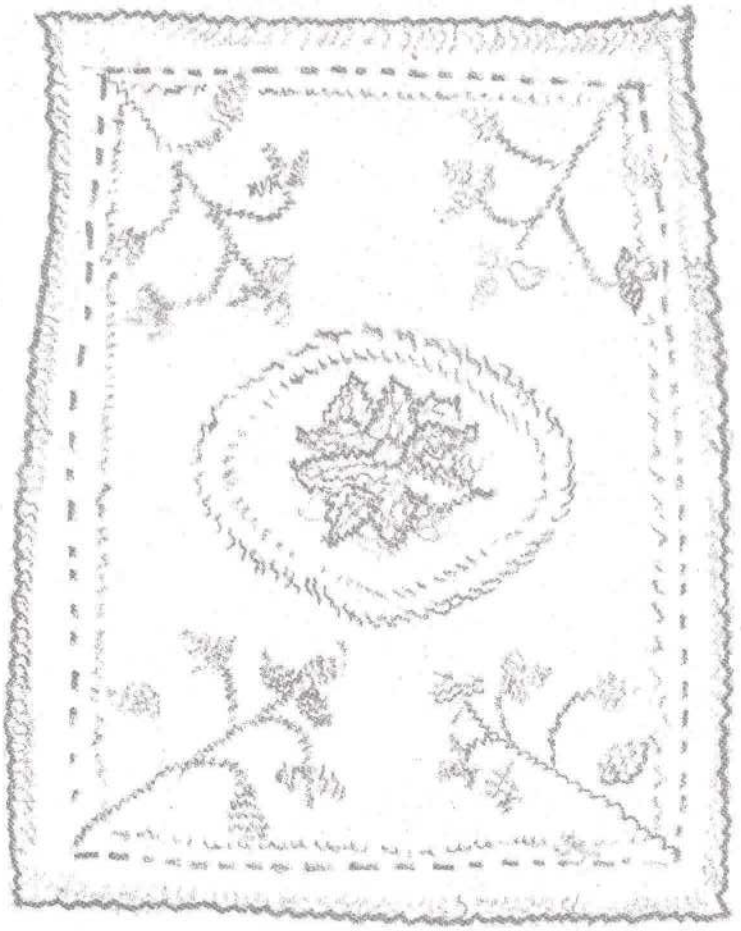

লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব'৯৬ এর মেলা প্রাঙ্গনের পরিকল্পনা চিত্র

১। হাতী গেইট
২। আলপনা খচিত ডালা কুলা
৩। ফাউণ্ডেশনের মনোগ্রাম খচিত রঙ্গিন পতাকা
৪। শ্লোগানের বেনার
৫। বৃহদাকার নকশী পাখার মডেল ও বেইজ
৬। কারুটাওয়ার
৭। প্রধান অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য ডালা কুলা হাতে স্কুলের ছাত্রী
৮। দেয়াল চিত্র
৯। সুসজ্জিত কারুব্রীজ
১০। খেলার মাঠের প্লেকার্ড এবং খেলার মাঠ
১১। খেলার মাঠের দর্শক পেন্ডেল
১২। জীবন্ত প্রদর্শনীর দর্শক পেন্ডেল
১৩। লাইব্রেরী ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার
১৪। নাগর দোলা
১৫। ক্যাফেটোরীয়া
১৬। কারুমঞ্চ
১৭। মঞ্চের সামনের দর্শক পেন্ডেল
১৮। মন্দির বাড়ী
১৯। মেলার ষ্টল
২০। বিশেষ প্রদর্শনীর প্যাভিলিয়ন
২১। ফাউন্ডেশনের বিক্রয় কেন্দ্র
২২। কাঠের ব্রীজ
২৩। কারুপল্লীর গেইট
২৪। কারুপল্লীর সাজসজ্জার প্লেক
২৫। পিকনিক স্পট (উপজাতীয়
২৬। কারুপল্লীর স্টল
২৭। সেমিনার হল
২৮। সেমিনারের সাজসজ্জা
২৯। কারু ঘাট